তিন গোয়েন্দা

কিশোর থ্রিলার

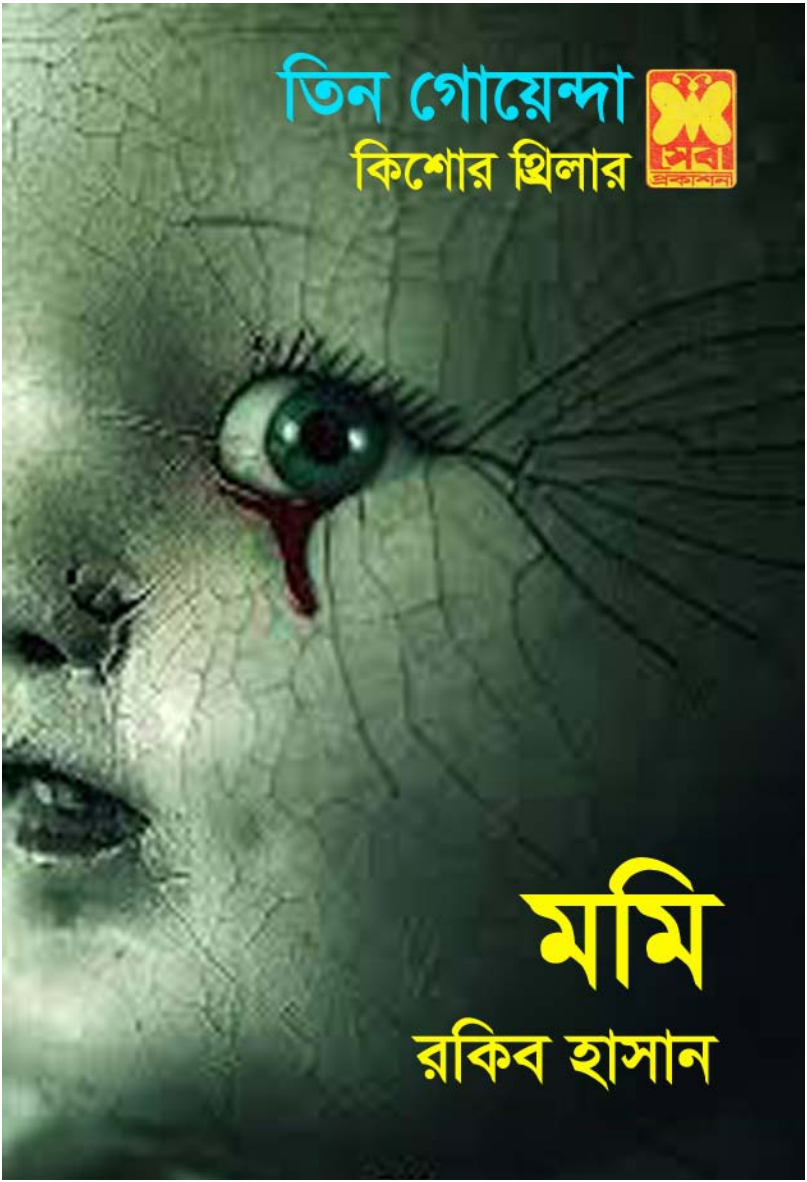

মমি

রকিব হাসান

ISBN 984-16-1274-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮১৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ঊনপঞ্চাশ টাকা

মমি

প্রথম প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে ব্যস্ততা।

চাচীকে সাহায্য করছে কিশোর পাশা, আর তার দুই বন্ধু মুসা আমান ও রবিন মিলফোর্ড।

তিন চাকার ছোট্ট গাড়ি নিয়ে ইয়ার্ডের ভেতরে এসে ঢুকল পোস্টম্যান। একগাদা পুরানো লোহা-লক্কড়ের কাছে দাঁড়ানো মারিয়া পাশার দিকে চেয়ে আস্তে করে মাথা ঝোঁকাল একবার, তারপর এগিয়ে গেল কাঁচে ঘেরা ছোট্ট অফিস ঘরের দিকে। বারান্দার দেয়ালে ঝোলানো চিঠির বাক্সে একগাদা চিঠি ফেলে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

'হায় আল্লাহ্!' বলে উঠলেন মেরিচাচী, ভুলেই গিয়েছিলাম! কিশোর বাপ, এক দৌড়ে পোস্ট অফিসে যা তো! একটা জরুরি চিঠি রেখে গেছে তোর চাচা, পোস্ট করে দিয়ে আয়।'

অ্যাপ্রনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দোমড়ানো একটা খাম বের করলেন মেরিচাচী। হাত দিয়ে ডলে সমান করে বাড়িয়ে দিলেন কিশোরের দিকে।

'রেজিস্ট্রি করে পাঠাস,' বললেন মেরিচাচী। আরেক পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন কিশোরকে। 'সকালের ডাক ধরাতে পারিস কিনা দেখিস।'

'পারব,' কিশোরের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস। 'মুসা আর রবিনকে খাটিয়ে নাও এই সুযোগে।' দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। তাড়াতাড়ি সাইকেল বের করে চড়ে বসল।

গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল কিশোর। সেদিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসলেন মেরিচাচী। মুসা আর রবিনকে বললেন, 'চল, চিঠিপত্রগুলো দেখে ফেলি। আজকাল কিশোরের নামেও অনেক চিঠি থাকে।'

খুশি মনেই মেরিচাচীকে অনুসরণ করল দুই গোয়েন্দা।

বাক্স খুলে চিঠিগুলো নিয়ে অফিসে এসে বসলেন মেরিচাচী। একটা চিঠি খুলে দেখলেন। 'হুঁম্‌ম্‌, একটা বাড়ির মাল নিলাম হবে।...এটা, বিল...একটা স্টীম বয়লার বিক্রি করেছিলাম, আর বিল।...আরেকটা বিল।...ও, এটা এসেছে আমার বোনের কাছ থেকে।...এটা?...একটা বিজ্ঞাপন টেলিভিশনের...।' একটার পর একটা চিঠি খুলে দেখছেন, আর মন্তব্য করছেন চাচী। রাশেদ চাচার নামে ব্যক্তিগত চিঠিও আছে গোটা দুয়েক। ওগুলো খুললেন না। আরও দুটো চিঠির নাম

ঠিকানা দেখে সামান্য ভুরু কোঁচকালেন। মৃদু একটা হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ঠোঁটে। খুললেন না এ দুটোও, আড়চোখে তাকালেন একবার মুসা আর রবিনের মুখের দিকে। বড়ই হতাশ হয়েছেন যেন, এমনি ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। 'নাহ্,' কিশোরের জন্যে কিছুই নেই। দুই গোয়েন্দার দিকে সরাসরি তাকালেন। 'তবে, তিন গোয়েন্দার নামে আছে দুটো, এই যে। নেবে নাকি? না কিশোরের হাতে দেব?'

মেরিচাচীর কথা শেষ হওয়ার আগেই ছোঁ মেরে চিঠি দুটো তুলে নিল মুসা। রবিনের দিকে চেয়ে বলল, 'হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছি!' ছুটে বেরিয়ে গেল অফিস থেকে।

মুসার পেছনেই বেরোল রবিন। ফিরে চাইলে দেখতে পেত, সস্নেহ হাসি ফুটছে মেরিচাচীর ঠোঁটে।

পেছনে ফিরে তাকাল একবার মুসা, 'আমাদের অফিশিয়াল কিছু হতে পারে, গোপনীয়। তাই ওখানে খুললাম না। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে খুলব।'

মাথা কাত করল রবিন।

দুই সুড়ঙ্গের সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। লোহার পাতটা সরিয়েই ঢুকে পড়ল পাইপের ভেতরে।

মোবাইল হোমের ভেতরে অন্ধকার। সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল মুসা। ফিরে তাকাল। রবিনও ঢুকছে।

দুটো চিঠিরই কোণের দিকের ঠিকানা পড়ল মুসা। 'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত গলায়। 'একটা এসেছে মিস্টার ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে। এটাই আগে খুলি।'

রবিনও উত্তেজিত। 'না, এটা পরে। কাজের কিছু থাকলে ওটাতেই আছে। আচ্ছা, কিশোরের ফেরার অপেক্ষা করবে?'

'এত সৌজন্য না দেখালেও চলবে,' ঝাঁঝাল কণ্ঠ মুসার। 'একটু আগে কি বলল? আমাকে আর তোমাকে খাটিয়ে নিতে। ওসব অপেক্ষা-টপেক্ষার দরকার নেই। খোল। রেকর্ড রাখার আর পড়াশোনার দায়িত্ব তোমার ওপর। তার মানে চিঠি খোলারও।'

মুসার কথায় যুক্তি আছে, আর কিছু বলল না রবিন। একটা চিঠি নিয়ে সাবধানে ছুরি ঢুকিয়ে দিল এক প্রান্তে। কাটল। 'আচ্ছা মুসা, চিঠিটা পড়ার আগে চিন্তা করে দেখি, দেখেই কিছু বোঝা যায় কিনা। কি বল? শার্লক হোমস চিঠি দেখেই অনেক কিছু বলে দিতে পারতেন ওটা সম্পর্কে। কিশোরও তাই বলে, শুধু দেখেই নাকি অনেক কিছু বলে দেয়া যায়। এস, চেষ্টা করে দেখি।'

'শুধু দেখেই কি আর বলা যাবে?' সন্দেহ ফুটেছে মুসার চোখে।

জবাব দিল না রবিন। গভীর মনোযোগে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করছে খামটা।

হালকা নীল রঙ। নাকের কাছে তুলে শুঁকল। লাইলাক ফুলের গন্ধ। ভেতরের কাগজটা বের করল। গন্ধ আর রঙ খামটার মতই। চিঠির কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটা ছবি ছাপা, দুটো বেড়ালের বাচ্চা খেলছে।

'হুঁম্‌ম্‌!' গম্ভীর হল রবিন। কপালে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে টোকা দিল বার দুই, যেন মগজটাকে খোলাসা করে নিতে চাইছে। 'হ্যাঁ, আমার কাছেই এসেছে এটা (সিনেমায় দেখা শার্লক হোমসের কথা আর ভঙ্গি নকলের চেষ্টা করছে)। পাঠিয়েছেন এক মহিলা। বয়েস, এই, পঞ্চাশের কাছাকাছি। বেঁটেখাট, মোটা। চুলে রঙ মাখানো। কথা বলেন প্রচুর। বেড়াল বলতে পাগল। মনটা খুব ভাল। মাঝে মাঝে সামান্য খেয়ালী হয়ে পড়েন। এমনিতে তিনি হাসিখুশি, তবে এই চিঠি লেখার সময় খুব দুশ্চিন্তায় ছিলেন।'

ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন মুসার দুই চোখ। 'খাইছে! শুধু ওই খাম আর চিঠির কাগজ দেখেই এত কিছু জেনে গেলে!'

'নিশ্চয়,' রবিন নির্লিপ্ত। 'আর হ্যাঁ, মহিলা খুব ধনী। সমাজসেবা করেন।'

রবিনের হাত থেকে খাম আর চিঠিটা নিল মুসা। উল্টেপাল্টে দেখল। ভুরু কুঁচকে গেছে। অবশেষে আগের জায়গায় ফিরে গেল আবার ভুরু। 'বেড়ালের বাচ্চার ছবি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, মহিলা বেড়াল ভালবাসেন। স্ট্যাম্পের পাতা থেকে তাড়াহুড়ো করে খুলেছেন স্ট্যাম্প, একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে, তারমানে খামখেয়ালী। লেখার স্টাইল দেখে বোঝা যাচ্ছে, হাসিখুশি। নিচের লাইনগুলো আঁকাবাঁকা, লেখাও কেমন খারাপ, অর্থাৎ কোন একটা ব্যাপার নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'ঠিক জায়গায় নজর দিতে পারলে ডিডাকশন খুব সহজ।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল মুসা। 'শার্লক হোমস কিংবা কিশোর পাশার শাগরেদ হতে পারলে, এ-বিদ্যা শেখা আরও সহজ। কিন্তু, তুমিও কম না। মহিলার বয়স, আকৃতি, ধনী, চুলে রঙ করেন, বেশি কথা বলেন, এগুলো জানলে কি দেখে?'

হাসল রবিন। 'খামের কোণে মহিলার ঠিকানা রয়েছে। সান্তা মনিকার। জায়গাটা ধনীদের এলাকা, জানই। আর ওখানকার ধনী বয়স্কা মহিলাদের সময় কাটানর জন্যে সমাজসেবা ছাড়া আর তেমন কিছুই করার নেই।'

'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু চুলের রঙ? বয়স? বেশি কথা বলে? আকৃতি? এসব কি করে বুঝলে?'

'বুঝেছি,' সহজ গলায় জবাব দিল রবিন। 'লাইলাক ফুলের রঙ আর গন্ধ পছন্দ মহিলার, সবুজ কালিতে লেখেন। বয়স্কা মহিলাদেরই এসব রঙ আর গন্ধ বেশি পছন্দ। আমার খালাও পছন্দ করেন। তাঁর বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি, মোটাসোটা. বেঁটে. বেশি কথা বলেন, চুলে রঙ লাগান—তবে চিঠি লেখিকার

ব্যাপারে এসব সত্যি নাও হতে পারে। স্রেফ অনুমান করেছি। শিওর বলতে পারব না।' চিঠির নিচে সইটা আরেকবার দেখল রবিন। 'তবে একেবারে ভুল, তাও বলব না। আমার খালা আর এই মিসেস ভেড়া চ্যানেলের অনেক কিছুতেই মিল দেখতে পাচ্ছি।'

হাসল মুসা। 'আমাকে বোকাই বানিয়ে ফেলেছিলে। তবে, ডিডাকশন ভালই করেছ। শেষগুলো সত্যি হলে একশোতে একশোই দেয়া যায়। আচ্ছা, এবার দেখা যাক, কি লিখেছেন মহিলা।'

চিঠিটা মুসাকে শুনিয়ে জোরে জোরে পড়ল রবিন। মিসেস চ্যানেলের একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল ছিল, নাম স্ফিঙ্কস। মহিলার খুব আদরের প্রাণী। হপ্তাখানেক আগে নিখোঁজ। পুলিশকে খবর দিয়েও লাভ হয়নি, তারা বেড়ালের ব্যাপারে উদাসীন। খবরের কাগজে ইদানীং তিন গোয়েন্দার খুব নাম দেখে চিঠি পাঠিয়েছেন। যদি তাঁরা তাঁর বেড়ালটা খুঁজে বের করে দেয়, কৃতজ্ঞ হবেন।

'বেড়াল নিখোঁজ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা, 'আমাদের জন্যে কেসটা ভালই। সহজ, বিপদ নেই, কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। মহিলাকে রিং করে বলি, কেসটা নিলাম...'

'দাঁড়াও,' মাথা তুলল রবিন। 'মিস্টার ক্রিস্টোফার কি লিখেছেন, পড়ি আগে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' ফোনের দিকে এগোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়েছে মুসা।

দ্বিতীয় খামটা খুলে ফেলল রবিন। খুব দামি বণ্ড পেপারে লেখা একটা চিঠি। ওপরে এক পাশে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের নাম-ঠিকানা ছাপা।

মুসাকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন। প্রথম বাক্যটা পড়েই থমকে গেল। তারপর খুব দ্রুত চোখ বোলাল পরের লাইনগুলোর ওপর। মুখ তুলে দেখল, অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে গোয়েন্দা-সহকারী।

'সর্বনাশ!' জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছে যেন রবিন। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে। 'নাও, নিজেই পড়। আমি বললে বিশ্বাস করবে না।'

নীরবে চিঠিটা নিল মুসা। রবিনের মতই দ্রুত পড়ে শেষ করল। মুখ তুলে তাকাল রবিনের দিকে। বিস্ময়ে কোটর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার চোখ। 'ইয়াল্লা!' ফিসফিস করে বলল। 'তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে।'

দুই

রকি বীচ থেকে মাইল বারো দূরে, হলিউডের বাইরে একটা গিরি সঙ্কট। পাহাড়ের ঢালে এখানে কয়েকটা বড়সড় বাংলোমত বাড়ি, প্রচুর পয়সা খরচ করে তৈরি

হয়েছে। বাড়িগুলোকে ঘিরে আছে গাছপালা, ঝোপঝাড়। পুরানো স্প্যানিশ রীতির একটা বড় বাড়ি আছে, একটা অংশকে ব্যক্তিগত জাদুঘর বানিয়ে নিয়েছেন বাড়ির মালিক প্রফেসর বেনজামিন, একজন বিখ্যাত ইজিপটোলজিস্ট– মিশর-তত্ত্ববিদ। প্রাচীন মিশর ও পিরামিড সম্পর্কে তার অগাধ জ্ঞান।

বাড়িটার জানালাগুলো আবার ফরাসী রীতির বড় বড়, জানালা প্রায় মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে। একটা বিশেষ ঘরের জানালা বন্ধ। সেই জানালার পাশে সারি দিয়ে সাজানো কয়েকটা মূর্তি, প্রাচীন মিশরীয় কবর খুঁড়ে বের করে আনা। একটা মূর্তি ভারি কাঠের তৈরি। শরীর মানুষের, মুখটা শেয়ালের। প্রাচীন দেবতা, আনুবিস। শার্সি ভেদ করে ঢুকছে পড়ন্ত বিকেলের রোদ, মেঝেতে ছায়া পড়েছে আনুবিসের। শেয়ালের মত মুখের ছায়া অনেকটা বেশি লম্বা হয়ে পড়েছে মেঝেতে, দেখলেই গা ছমছম করে।

মিশরের পিরামিড আর প্রাচীন কবর থেকে তুলে আনা আরও সব জিনিসে প্রায় ঠাসা ঘরটা। দেয়ালে ঝুলছে ধাতব মুখোশ, সে মুখোশের বিকৃত ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। মাটির তৈরি চাকতি আর ছোট ছোট ফলক, সোনার গয়না, সবুজ পাথর থেকে খোদাই করা 'পবিত্র' গোবরে পোকার প্রতিকৃতি সাজানো রয়েছে কাচের বাক্সে। একটা জানালার কাছে রাখা আছে একটা মমির-কফিন, কাঠের তৈরি ডালা আটকানো। অতি সাধারণ কফিন। গায়ে সোনার পাত নেই, নেই রঙে আঁকা কোনরকম নকশা বা ছবি। বিলাসিতা বা আড়ম্বরের কোন ছাপই নেই ওটাতে।

কফিনটা এক রহস্য, এমনকি প্রফেসর বেনজামিনের কাছেও : ওটা তাঁর গর্বের বস্তু।

প্রফেসর বেনজামিন, ছোটখাট একজন মানুষ, শরীরের তুলনায় ভুঁড়িটা সামান্য বড়, চেহারা আরও সম্ভ্রান্ত করে তুলেছে কাঁচা পাকা দাড়ি। চোখে গোল্ড-রিম চশমা।

তরুণ বয়সটা এবং তারপরেরও অনেকগুলো বছর মিশরেই কাটিয়েছেন প্রফেসর। প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক অভিযানে অংশ নিয়েছেন। আবিষ্কার করেছেন অনেক পুরানো কবর, ঢুকেছেন পিরামিডের তলায়। দেখেছেন হাজার হাজার বছর আগের ফারাও, তাদের রানী আর চাকর-বাকরের মমি—বিচিত্র অলঙ্কার আর জিনিসে জড়ানো। মূর্তি আর অন্যান্য জিনিসপত্র ওখান থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কয়েক বছর আগে ফিরে এসেছেন দেশে। প্রাচীন মিশরে তাঁর আবিষ্কার আর অভিযানের ওপর একটা বই লিখেছেন।

ওই কফিন আর ভেতরের মমিটা তাঁর কাছে এসে পৌঁছেছে মাত্র এক হপ্তা হল। এটা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে। সে সময় এবং তার পরের অনেকগুলো বছর খুব ব্যস্ত ছিলেন, নজর দিতে পারেননি মমিটার দিকে।

ওটা গচ্ছিত রেখেছিলেন কায়রোর এক জাদুঘরে। দেশে ফিরে চিঠি লিখেছেন। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ মমিটা পাঠিয়ে দিয়েছে প্রফেসরের ঠিকানায়, ওটার ওপর প্রচুর গবেষণা চালানর ইচ্ছে আছে তাঁর।

মি. ক্রিস্টোফার তিন গোয়েন্দাকে চিঠি পাঠানর দু'দিন আগে।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর বেনজামিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। মাঝে মাঝে হাতের পেন্সিল দিয়ে আস্তে টোকা দিচ্ছেন কফিনের ডালায়। এত সাধারণ একটা কাঠের কফিনে কেন রাখা হয়েছে এই মমি! বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন অস্বস্তি বোধ করছেন।

প্রফেসরের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে তাঁর খানসামা হুপার। লম্বা, রোগাটে একজন মানুষ। অনেক বছর ধরে কাজ করছে তাঁর এখানে।

'স্যার, আবার খুলতে চান এটা?' বলল হুপার। 'গতকাল ওই কাণ্ড ঘটার পরেও?'

'আবার ঘটুক, তাই আমি চাই,' জোর দিয়ে বললেন প্রফেসর। 'জানালাগুলো খুলে দাও। কতবার না বলেছি, বন্ধ ঘরে দম আটকে আসে আমার!'

'এই দিচ্ছি, স্যার,' তাড়াতাড়ি কাছের জানালাটা খুলে দিল হুপার। অন্যগুলোও খুলতে এগোল।

কয়েক বছর আগে একটা কবরে আটকা পড়ে যান প্রফেসর বেনজামিন। দু'দিন ওই বন্ধ ঘরে আটকে থাকার পর বের করে আনা হয় তাঁকে। সেই থেকেই বন্ধ যে-কোন রকম ঘরের ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্মেছে তাঁর।

সবক'টা জানালা খুলে দিয়ে এল হুপার। ডিবার ডালার মত আলগা চারকোনা কফিনের ডালা। তুলে ওটা কফিনের পাশেই দাঁড় করিয়ে রাখল সে। দু'জনেই সামান্য ঝুঁকে তাকাল কফিনের ভেতরে।

'বাহ্, তোমার সাহস আছে বলতে হবে, হুপার,' প্রশংসা করলেন প্রফেসর। 'অনেকেই মমির দিকে তাকাতে সাহস করে না। অথচ একে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। বিটুমিন আর অন্যান্য আরকে ভিজিয়ে, লিনেন জড়িয়ে রাখা হত হাজার হাজার বছর আগের মিশরীয় রাজ-রাজাদের দেহ। হয়ত ওদের বিশ্বাস ছিল, দেহটা ঠিক থাকলে মৃত্যুর পরের জগতে ঢোকা খুব সহজ হবে। আরেক দুনিয়ায় গিয়ে যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয়, সেজন্যে সঙ্গে দেয়া হত সব রকমের দরকারি জিনিসপত্র। চাকর-বাকরদেরও মেরে মমি বানিয়ে রেখে দেয়া হত রাজার পাশের কোন কক্ষে। আরেক জগতে চাকরেরও অভাব হবে না রাজার, এই বিশ্বাসে। কী অদ্ভুত ধর্ম, আর বিশ্বাস!' আবার মমিটার দিকে তাকালেন তিনি। ভেতরের দিকে কফিনের গায়ে খোদাই করা আছে, 'রা-অরকন'-এর নাম। মমি জড়িয়ে থাকা লিনেনের একটা অংশ খোলা। ফলে রা-অরকনের চেহারা দেখা যাচ্ছে। গাঢ় রঙের কাঠ কুঁদে তৈরে যেন মুখ। ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে আছে কথা

বলতে চায় বুঝি! চোখ বোজা।

'রা-অরকনকে আজ খুব শান্ত মনে হচ্ছে, স্যার,' বলল হুপার। 'আজ হয়ত কথা বলবে না।'

'না বললেই ভাল। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি কথা বলে এটা খুবই অস্বাভাবিক!'

'হ্যাঁ, স্যার!'

'অথচ, গতকাল ফিসফিস করে কি যেন বলেছিল!' আপনমনেই বললেন প্রফেসর। 'গতকাল এঘরে একা ছিলাম হুপার, তখন কথা বলে উঠছিল মমিটা। অদ্ভুত ভাষা, বুঝিনি! তবে কথার ধরনে মনে হয়েছে আমাকে কিছু একটা করতে বলছে ও!'

মমিটার ওপর আবার ঝুঁকলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন, আজও কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান? বলুন। আমি শুনছি।'

চুপ করে রইল মমি। এক মিনিট কাটল। দুই। ঘরে এসে ঢুকেছে একটা মাছি, ওটার ভনভন ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই।

'আমার কল্পনাও হতে পারে,' আপন মনেই কথা বলছেন প্রফেসর। 'না, কাল কোন কথা বলেনি মমি। ওটা নিছকই আমার কল্পনা। হুপার, ওয়ার্কশপ থেকে ছোট করাতটা নিয়ে এস। কফিন থেকে ছোট এক টুকরো কাঠ কেটে নেব, আজই পাঠাব ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটিতে। কার্বন টেস্ট করিয়ে মমিটার আসল বয়স জানার দরকার।'

'ঠিক আছে, স্যার, যাচ্ছি।' বেরিয়ে গেল হুপার।

কফিনের ওপর ঝুঁকলেন প্রফেসর। টোকা দিয়ে দিয়ে দেখলেন। কোথা থেকে কাটলে ভাল হবে? একটা জায়গায় ফাঁপা মনে হল টোকার শব্দ। চিলতে কাঠ ভরে ফোকরের মুখ বন্ধ করা হয়েছে যেন।

কাজে মগ্ন প্রফেসর। হঠাৎ কানে এল চাপা বিড়বিড় শব্দ, কফিনের ভেতর থেকেই আসছে! ঝট করে সোজা হয়ে গেলেন তিনি। চোখে অবিশ্বাস। আবার ঝুঁকে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গেলেন।

হ্যাঁ, মমিই! ফিসফিস করে কি যেন বলছে! সামান্য ফাঁক করা ঠোঁটের ভেতর থেকেই যেন বেরিয়ে আসছে শব্দগুলো। মিশরীয় ভাষা, কোন সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কোন ভাষা, বোঝা গেল না। তিন হাজার বছর আগের কোন ভাষা হবে, অনুমান করলেন তিনি। একটা শব্দও বুঝতে পারছেন না প্রফেসর। কেমন খসখসে কণ্ঠস্বর, কথার ফাঁকে ফাঁকে চাপা হিসহিসানী। এতই নিচু কণ্ঠস্বর, কোনমতে শুনতে পাচ্ছেন তিনি। মাঝে মাঝে বেড়ে গিয়ে পরক্ষণেই আবার ঝপ করে খাদে নেমে যাচ্ছে আওয়াজ। মমিটা তাকে কিছু বোঝানর জোর চেষ্টা চালাচ্ছে যেন।

উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন প্রফেসর। ভাষাটা বোধহয় আরবী, তবে অনেক প্রাচীন। দু'য়েকটা শব্দও কেমন পরিচিত লাগছে না!

'বলে যান, রা-অরকন!' অনুরোধ জানালেন প্রফেসর। 'বোঝার চেষ্টা করছি আমি।'

'স্যার?'

বোমা ফাটল যেন ডাকটা! চমকে উঠে পাঁই করে ঘুরলেন প্রফেসর। এতই মগ্ন ছিলেন, হুপার এসে ঢুকেছে, টেরই পাননি। নীরব হয়ে গেছে রা-অরকন।

করাতটা মালিকের দিকে বাড়িয়ে দিল হুপার।

'হুপার!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আবার কথা বলেছে মমি! তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই শুরু করেছে! যেই ঘরে ঢুকেছ, থেমে গেছে!'

হঠাৎ বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গেল হুপার। ভ্রূকুটি করল। 'তার মানে, আপনি একা না হলে ওটা কথা বলে না! কি বলস, বুঝতে পেরেছেন, স্যার?'

'না!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'ইস্‌স্‌, কেন যে ভাষাবিদ হলাম না! প্রাচীন আরবীই বলছে বোধহয়। হিট্টাইট কিংবা শ্যালডিনও হতে পারে!'

ভারি ভারি সব শব্দ! উচ্চারণ করতেই কষ্ট হয় হুপারের, মানে বোঝা তো দূরের কথা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। চোখে পড়ছে গিরিপথের ওপারে প্রায় একশো গজ দূরে ঢালের গায়ে আরেকটা বাড়ি। নতুন তৈরি হয়েছে, আধুনিক ধাঁচ।

'এত ভাবনার কি আছে, স্যার?' হাত তুলে বাড়িটা দেখাল হুপার। প্রফেসর উইলসন তো কাছেই থাকেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন। রা-অরকনের কথা তিনি বুঝতে পারবেন। অবশ্য যদি তাঁর সামনে কথা বলে মমিটা।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আরও আগেই ডাকা উচিত ছিল জিমকে। জান না বোধহয়, রা-অরকনকে খোঁজার সময় ওর বাবা ছিল আমার সঙ্গে। আহা, বেচারা! মমিটা খুঁজে পাওয়ার এক হপ্তা পরেই নৃশংসভাবে খুন করা হল তাঁকে! কে, কেন করল, কিচ্ছু জানা যায়নি!...যাকগে, তুমি এখনি ফোন কর জিমকে। বল, আমি ডাকছি। এখুনি যেন চলে আসে।'

'যাচ্ছি, স্যার।'

হুপার বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কথা বলে উঠল মমি। শুরু হয়ে গেল তার গা ছমছম-করা ফিসফিসানী।

মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কথা বোঝার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন আরেকবার প্রফেসর। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সোজা হলেন। তাকালেন গিরিপথের ওপারের বাড়িটার দিকে। গিরিখাতগুলো এখানে অদ্ভুত। পথের অনেক নিচে নেমে গেছে ওপাশে পাহাড়ের ঢাল। ভাষাবিদ জিম উইলসনের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে পথের সমতলের বেশ অনেকখানি নিচে।

দেখতে পাচ্ছেন প্রফেসর, বাড়ির একপাশের দরজা দিয়ে বেরোলেন ভাষাবিদ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন গ্যারেজে। গাড়ি বেরোল। ছোট্ট একটা ব্রিজ পেরিয়ে নামল পেঁচানো সরু গিরিপথে। চোখ যেদিকেই থাক, প্রফেসরের কান রয়েছে মমির দিকে। ফিসফিস থামিয়ে দিয়েছে ওটা, বোধহয় কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন প্রফেসর। যদি কথা না বলে মমিটা? প্রফেসর উইলসন এসেও কিছু করতে পারবেন না। কথা না শুনলে মানে বলবেন কি করে?

'কথা থামাবেন না, রা-অরকন! প্লীজ!' অনুরোধ করলেন প্রফেসর বেনজামিন। 'প্লীজ, আবার বলুন! আমি শুনছি। বোঝার চেষ্টা করছি।'

নীরব হল মমি। বাইরে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকলেন জিম উইলসন।

'এই যে জিম, এসে পড়েছ,' বলে উঠলেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন উইলসন।

'এদিকে এস। অদ্ভুত একটা ভাষা শুনতে পাবে!'

পাশে এসে দাঁড়ালেন উইলসন। চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর, 'রা-অরকন, প্লীজ! কথা বলুন, যা বলছিলেন এতক্ষণ, আবার বলুন!'

নীরব রইল মমি, এ-ঘরে আসার আগের তিনশো শতাব্দী যেমন ছিল।

'কাকে কি বলছেন বুঝতে পারছি না!' উইলসনের কণ্ঠে বিস্ময়। হালকা-পাতলা শরীর, মাঝারি উচ্চতা, হাসি-খুশি সুন্দর চেহারা। বয়স, এই পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। ভারি চমৎকার কণ্ঠস্বর। 'ওই শুকনো লাশকে কথা বলতে বলছেন নাকি!'

'হ্যাঁ,' কণ্ঠস্বর খাদে নামালেন প্রফেসর। 'ফিসফিস করে কথা বলে। অদ্ভুত ভাষায়। শুধু আমার সঙ্গে। অন্য কাউকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই...।' ভাষাবিদের চাহনী দেখে থেমে গেলেন তিনি। 'তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? রা-অরকন আমার সঙ্গে কথা বলে, বিশ্বাস করতে পারছ না?'

গাল চুলকালেন। 'বিশ্বাস করা কঠিন। তবে নিজের কানে শুনলে...'

'চেষ্টা করে দেখি,' মমির ওপর ঝুঁকলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন, কথা বলুন। বোঝার চেষ্টা করব আমরা।'

দু'জনেই অপেক্ষা করে রইলেন। রা-অরকনের মমি নীরব।

'কোন লাভ নেই,' শব্দ করে শ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'তবে, কথা বলেছিল ও। বিশ্বাস কর। আবার হয়ত আমি একা হলেই বলবে। তোমাকে শোনাতে পারলে ভাল হত। কি বলছে বুঝতে পারতে।'

ভাবভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছে প্রফেসরের কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না

উইলসন। 'হ্যাঁ, তা হয়ত পারতাম।...আপনার হাতে ওটা কি? করাত...মমিটা কেটে ফেলবেন নাকি?'

'না, না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'কফিনের কোণ থেকে সামান্য কাঠ নিয়ে কার্বন টেস্টের জন্যে পাঠাব। রা-অরকনকে কবে কবর দেয়া হয়েছিল জানা যাবে।'

'মূল্যবান জিনিসটা কেটে নষ্ট করবেন!' ভুরু কোঁচকালেন উইলসন। 'তার কি দরকার আছে?'

'এই মমি আর কফিন সত্যিই মূল্যবান কিনা, এখনও জানি না। জানতে হলে কার্বন টেস্ট করতে হবে। তবে, অদ্ভুত রহস্যটার সমাধান করব আগে। কি বলে, জানব। তার আগে পাঠাচ্ছি না। সত্যি জিম, খুব অবাক হয়েছি! মমি কথা বলে! তা-ও আবার একা আমার সঙ্গে।'

'হুম্‌ম্‌।' বৃদ্ধ প্রফেসরের জন্যে করুণা হচ্ছে উইলসনের। 'এক কাজ করবেন? কয়েকদিনের জন্যে কফিনসহ মমিটা আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন। আমি একা থাকলে হয়ত আমার সঙ্গেও কথা বলতে পারে ওটা। বললে, বুঝতে পারবই। সমাধান হয়ে যাবে হয়ত রহস্যটার।'

উইলসনের দিকে তাকালেন প্রফেসর। গম্ভীর হয়ে গেছেন। 'থ্যাংক ইউ, জিম,' কণ্ঠস্বর ভারি। 'বুঝতে পারছি, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তোমার। ভাবছ, সব আমার অলীক কল্পনা। হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পর্কে শিওর না হয়ে মমি হাতছাড়া করছি না আমি।'

সামান্য একটু মাথা ঝাঁকালেন উইলসন। 'ঠিক আছে, রা-অরকন আবার কথা বললেই ডেকে পাঠাবেন আমাকে। চলে আসব। এখন যাই। ইউনিভার্সিটিতে সম্মেলন আছে।'

প্রফেসরকে 'গুড বাই' জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন প্রফেসর উইলসন।

মমির দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে রইলেন প্রফেসর বেনজামিন। নীরব রইল রা-অরকন।

'ডিনার দেব, স্যার?' দরজার কাছ থেকে হুপারের কথা শোনা গেল।

'হ্যাঁ,' মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্রফেসর। 'শোন, এসব কথা কাউকে কিচ্ছু বলবে না।'

'না, বলব না, স্যার।'

উইলসনের ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝে গেছি, কথাটা শুনলে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা কি ভাববে। মোটেই বিশ্বাস করবে না ওরা। মুখ টিপে হাসাহাসি করবে। বলবে, বুড়ো বয়সে পাগল হয়ে গেছি। খবরের কাগজে প্রকাশ করে দিলেই গেছি। সারা জীবনে যত সুনাম কামিয়েছি, সব যাবে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' মাথা ঝোঁকাল হুপার। 'হয়ত তাই ঘটবে।'

'কিন্তু, কারও না কারও কাছে কথাটা বলতেই হবে আমাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে কানের নিচে চুলকালেন প্রফেসর। 'এমন কেউ, যে বিজ্ঞানী নয়। যে জানে, অনেক রহস্যময় ঘটনা ঘটে এই দুনিয়ায়, যার কোন ব্যাখ্যা নেই। কিন্তু কাকে বলব?...কাকে...'

'স্যার, মি. ক্রিস্টোফারকে ফোন করে দেখুন না। তিনিও তো আপনার বন্ধু। আর রহস্য নিয়েই তার...'

'ঠিক, ঠিক বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'আজই যোগাযোগ করব ওর সঙ্গে। সারা আমেরিকায় যদি কেউ বিশ্বাস করে আমার কথা, একমাত্র ডেভিসই করবে।'

তিন

'মমি কথা বলে কি করে?' আবার একই প্রশ্ন করল মুসা।

জবাবে শুধু মাথা নাড়ল রবিন।

দু'জনেই বার বার পড়েছে চিঠিটা। বিশ্বাসই করতে পারছে না। ডেভিস ক্রিস্টোফারের কাছ থেকে না এলে এতক্ষণে ছুঁড়ে ফেলে দিত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে। কিন্তু ফালতু কথা বলেন না চিত্রপরিচালক। তিনি যখন বিশ্বাস করেছেন, নিশ্চয় ব্যাপারটা প্রফেসর বেনজামিনের কল্পনা-প্রসূত নয়। প্রফেসরকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছেন মি. ক্রিস্টোফার।

'মমি তো একটা মরা লাশ,' আবার বলল মুসা। 'কি করে কথা বলে!' ঝোঁকড়া কালো চুলে আঙুল চালাল সে। 'এককালে মানুষ ছিল অবশ্য, তবে এখন...'

'জ্যান্ত নয়,' মুসার কথাটা বলে দিল রবিন। 'ভূত-টুত ভাবছ না তো? অপছন্দ হচ্ছে ব্যাপারটা?'

'নিশ্চয়!' হাত বাড়িয়ে ডেস্কে রাখা চিঠিটা আবার তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল মুসা। 'প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিন প্রখ্যাত ইজিপট-অল...ইজিপট-অল...!'

'ইজিপটোলোজিস্ট,' বলে দিল রবিন।

ইজিপট-অল...ইজিপট-অল...আরে ধুত্তেরি! জাহান্নামে যাক! ঝাঁজিয়ে উঠল মুসা। তারপর নিজেকেই যেন বলল, 'হলিউডের কাছে হান্টার ক্যানিয়নে থাকেন প্রফেসর। ব্যক্তিগত জাদুঘর আছে। একটা মমি আছে সেখানে, যেটা কথা বলে, এবং ভাষাটা বুঝতে পারেননি প্রফেসর। খুব অস্বস্তি বোধ করছেন। ঠিকই করছেন, তাঁকে দোষ দেয়া যায় না। মমিটা দেখিনি, অথচ শুনেই অস্বস্তি লাগছে আমার। এ পর্যন্ত কয়েকটা রহস্যেরই তো সমাধান করলাম! বিশেষ করে ওই ছায়াশরীর আর হাউণ্ডের ব্যাপারটা এখনও মন থেকে যায়নি। রবিন, তার চেয়ে

চল সান্তা মনিকায় বেড়াল রহস্যের সমাধান করি গিয়ে।' টেবিল থেকে মিসেস ভেরা চ্যানেলের চিঠিটা তুলে নিল সে।

'কিশোর কোন্ কেসটা নিতে আগ্রহী হবে, জান,' গোমড়ামুখে বলল রবিন।

'জানি,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পড়ামাত্র তাঁকে টেলিফোন করবে সে। তারপরই ছুটবে প্রফেসর বেনজামিনের ওখানে। এক কাজ করি। এস, ভোট নিই। হারিয়ে দেব কিশোরকে। বেড়াল খোঁজার কাজটাই আগে করতে বাধ্য হবে সে।'

'ভোটাভুটিতে রাজিই হবে না সে,' ঠোঁট ওল্টাল রবিন। 'চেষ্টা করে তো দেখেছি আগেও। টেরোর ক্যাসলের কথা মনে নেই? যাব না বলেছিলাম, তুমি আমি দু'জনেই। শুনেছিল আমাদের কথা?'

চুপ করে রইল মুসা। গম্ভীর।

'কিন্তু ও আসছে না কেন এখনও!' সুড়ঙ্গমুখের দিকে তাকাল রবিন। 'গেল তো অনেকক্ষণ।'

'দাঁড়াও, দেখি,' বলল মুসা। 'হয়ত এসেছে, কোন কাজে আটকে দিয়েছে মেরিচাচী।' ছোট মোবাইল হোমের এক কোণে চলে এল সে। মাঝারি আকারের মোটা একটা পাইপ, ছাত ফুটো করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটাকে জায়গামত আটকানর ব্যবস্থা হয়েছে লোহার শিক দিয়ে। নিচের দিকে দু'পাশে আরও দুটো লোহার পাইপ—হ্যাণ্ডেল ধরে মূল পাইপটাকে ওঠানো-নামানো কিংবা এদিক-ওদিক ঘোরানর জন্যে। আসলে ওটা একটা পেরিস্কোপ, প্রথম মহাযুদ্ধের একটা সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়েছিল। পুরানো বাতিল অন্যান্য লোহার জিনিসের সঙ্গে ওটাও কিনে এনেছেন রাশেদ চাচা। জিনিসটাকে মেরামত করে হেডকোয়ার্টারের ছাতে লাগিয়ে নিয়েছে তিন গোয়েন্দা। দিব্যি কাজ চলে এখন। কিশোর এক অদ্ভুত নাম দিয়েছে পেরিস্কোপটার, 'সর্ব দর্শন'।

হ্যাণ্ডেল ধরে পেরিস্কোপটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল মুসা। আয়নায় চোখ রাখল। যন্ত্রটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নজর বোলাল ইয়ার্ডে। নির্দিষ্ট একটা অবস্থানে এনে স্থির করল। 'একজন খদ্দের দেখতে পাচ্ছি। পাইপ বিক্রি করেছেন মেরি চাচী। জঞ্জাল সরাচ্ছে বোরিস···। আর, ওই যে, কিশোর,' সামান্য ঘোরাল পেরিস্কোপ। 'ফিরে এসেছে। ঠেলে ঠেলে আনছে সাইকেলটা। খারাপ হয়ে গেছে বোধহয় কিছু···হ্যাঁ, হ্যাঁ, সামনের টায়ার বসে গেছে। পাঙ্কচার।'

'পেরেক-টেরেক ঢুকেছে হয়ত,' মন্তব্য করল রবিন। 'দেরি এজন্যেই। কি মনে হচ্ছে চেহারা দেখে? রেগেছে খুব?'

'নাহ্, আশ্চর্য! সঙ্গের রেডিও শুনছে আর হাসছে,' বলল মুসা। 'সত্যিই আশ্চর্য! সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার, ঠেলে ঠেলে আনা! কার না মেজাজ খারাপ হয়? কিশোরের তো আরও বেশি হওয়ার কথা। যেরকম খুঁতখুঁতে। তা না

হাসছে!'

'ওর মতিগতি বোঝা মুশকিল!' বলল রবিন। 'কখন হাসবে, কখন রাগবে, আর কখন কি করে বসবে, সে-ই জানে! রেডিওতে মজার কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে বোধহয়।'

'কি জানি!' পেরিস্কোপ আরেকটু বাঁয়ে ঘোরাল মুসা। 'মেরিচাচীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কি যেন দিচ্ছে চাচীকে। কিছু বলছে। এদিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছেন চাচী। আমাদের কথাই বলছেন বোধহয়।...সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল কিশোর। অফিসে ঢুকছে।...দেরি করছে কেন? কি করছে?...ওই যে, বেরোচ্ছে।...আসছে, এদিকেই আসছে...'

'ওকে নিয়ে আজ একটু মজা করব,' হাসল রবিন। 'মিস্টার ক্রিস্টোফারের চিঠিটা পকেটে রেখে দিয়েছি। মিসেস চ্যানেলারটা দেখাব আগে, কেসটা নিতে বলব। রাজি হলে তারপর দেখাব আসল চিঠি।'

'বেড়ালটা পাওয়ার আগে দেখিও না, খবরদার!' হাসল মুসা। 'আরেকটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। আমি যা যা বলব, সায় দেবে। কিংবা চুপ করে থাকবে। অন্তত প্রতিবাদ করবে না।'

অপেক্ষা করছে দুই গোয়েন্দা। পেরিস্কোপের কাছ থেকে সরে এসেছে মুসা। বাইরে টিনের পাত সরানর মৃদু শব্দ হল। খানিক পরেই খুলে গেল ট্রেলারের ভেতরে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনা। চট করে এসে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল মুসা। সুড়ঙ্গমুখে কিশোরের হাত দেখা গেল, তারপর মাথা। উঠে এল সে ট্রেলারে।

'উফ্‌ফ্! যা গরম!' ফুহ্‌হ্ করে মুখের ভেতর থেকে বাতাস বের করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা। 'এই গরমে সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার? ঠেলে আনা খুব কষ্টকর।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কি করে জানলে, সাইকেলের টায়ার পাঙ্কচার?'

'ডিডাকশন,' জবাব দিল মুসা। 'তুমিই তো ডিডাকশনের ওপর জোর দিতে বল। আমি আর রবিন এতক্ষণ ধরে তাই প্র্যাকটিস করছিলাম। না, রবিন?'

মাথা নাড়ল রবি। 'হ্যাঁ। অনেক পথ হেঁটে আসতে হয়েছে তোমাকে, কিশোর?'

চোখের পাতা কাছাকাছি চলে এসেছে কিশোরের। সতর্ক দৃষ্টিতে একবার তাকাল মুসার দিকে, তারপর রবিনের মুখের দিকে। 'হ্যাঁ, তা হয়েছে এখন বল, কি ডিডাকশন করলে? কি দেখে বুঝেছ, আমার সাইকেলের চাকা পাঙ্কচার হয়েছে?'

'কি দেখে মানে?' মুসার কণ্ঠে দ্বিধা। ঘাবড়ে গেছে মনে হচ্ছে।

'বল না, বলে দাও,' তাড়াতাড়ি পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল রবিন। শুরুতেই না সর্বনাশ করে দেয় মুসা!

'ইয়ে···মানে,' ঢোক গিলল মুসা। 'হ্যাঁ, দেখি তোমার হাত?' কিশোরকে বলল।

তালু চিত করে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর। ময়লা ধুলোবালি লেগে আছে। নিশ্চয় টায়ার ঘাঁটাঘাঁটি ছিল। পেরেকটা খুলে ফেলে দিয়েছে। 'বল, কি করে বুঝলে?'

'তোমার হাতে, হাঁটুতে ময়লা,' সামলে নিয়েছে মুসা। 'কিছু একটা পরীক্ষা করার জন্যে হাঁটু গেড়ে রাস্তায় বসে পড়েছিলে। ডিডাকশনঃ হাঁটু গেড়ে বসে পাঞ্চচার হওয়া টায়ার পরীক্ষা করেছ। তোমার জুতোতে প্রচুর ধুলো। ডিডাকশনঃ অনেক পথ হেঁটে এসেছ। তাই না, মাই ডিয়ার কিশোর পাশা?'

কিশোরের চেহারা দেখে মনে হল, খুব অবাক হয়েছে। 'চমৎকার। ভাল ডিডাকশন করতে শিখেছ। এই বুদ্ধি সাধারণ একটা বেড়াল খোঁজার পেছনে ব্যয় করার কোন মানে হয় না।'

'কি-ই!' চমকে উঠেছে।

'একটা আবিসিনিয়ান বেড়াল হারিয়েছে, ওটাকে খোঁজার কোন মানেই হয় না। তিন গোয়েন্দার জন্যে খুবই সহজ কাজ।' ভারিক্কি চালে বলল কিশোর, এটা মোটেই সহ্য হয় না মুসার। আড়চোখে একবার সহকারীর মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'তোমার মত বুদ্ধিমান গোয়েন্দার উপযুক্ত কাজ, মমির রহস্য ভেদ করা। তিন হাজার বছরের পুরানো মমি, যেটা ফিসফিস করে কথা বলে।'

'কার কাছে জানলে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'তোমরা যখন ডিডাকশনে ব্যস্ত,' সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি তখন মাইণ্ড রিডিং করেছি। রবিন, তোমার পকেটে রয়েছে একটা চিঠি, ওতে প্রফেসর বেনজামিনের ঠিকানা আছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ট্যাক্সি নেব। হাজার হোক, মিস্টার ক্রিস্টোফারের অনুরোধ আমরা ফেলতে পারব না কিছুতেই।'

হাঁ হয়ে গেছে অন্য দুই গোয়েন্দা। বোকার মত চেয়ে আছে কিশোরের মুখের দিকে।

চার

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে ট্যাক্সি। পেছনের সিটে গা এলিয়ে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে গাড়ি। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগছে।

'ইসস্!' সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল রবিন। 'ঝাঁকুনিতেই মেরে ফেলবে।

রোলস রয়েসটা হলে কি মজাই না হত! আমার একটা বাজি যদি লাগাত কোম্পানি!'

'ভেব না,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'শিগগিরই আবার ওটাতে চড়ব আমরা।'

'কি করে!' মুসা অবাক। 'তিরিশ দিন তো সেই কবেই পেরিয়ে গেছে!'

'দুয়ে দুয়ে চার হলেও, তিরিশ দিনে অনেক সময় তিরিশ হয় না,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমি বলে রাখছি, ওই গাড়িটা আবার ব্যবহার করব আমরা। মাসখানেকের জন্যে ভাড়া নিয়েছেন এক ব্যাংকার। মেয়াদ শেষ হলেই কোম্পানির অফিসে ফিরে আসবে গাড়িটা। তখন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বললেই...'

'দিয়ে দেবে!' ফস করে বলে উঠল মুসা। 'এতই সহজ!'

'একই কথা বলেছিলে মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে প্রথম দেখা করতে যাওয়ার আগে। যাকগে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমরা বোধহয় এসে গেছি।'

আঁকাবাঁকা গিরিপথে পাহাড়ের ঢাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। খানিক দূরেই বাড়িটা। পুরানো ধাঁচের পোর্টিকো, বিশাল সব থাম। একটা থামে বসানো পেতলের প্লেটে খোদাই করা রয়েছে প্রফেসর হাবার্ট বেনজামিনের নাম। গাছপালা ঝোপঝাড় ঘিরে রেখেছে লাল টালির ছাত দেয়া স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়িটাকে। একপাশে গোল হয়ে নেমে গেছে পাহাড়, সরু উপত্যকা সৃষ্টি করে ওপাশে আবার উঠে গেছে আরেকটা পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। ওই পাহাড়টার ঢালে বিভিন্ন সমতলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উঠেছে কয়েকটা বাড়ি। নতুন। বাংলো টাইপ।

'চল নামি,' বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। দরজা খুলে নেমে পড়ল ট্যাক্সি থেকে।

রবিন আর মুসাও নামল। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলল কিশোর।

'কিশোর, আমার ভয় করছে!' বলে উঠল মুসা। 'প্রফেসর বেনজামিন পাগল-টাগল নয় তো? বুড়ো ওই বিজ্ঞানীগুলো সাধারণত পাগলাটে হয়! বদমেজাজীও!'

'নাহ্,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আসার আগে তো টেলিফোন করলাম। গলা শুনে খুব ভদ্র বলেই মনে হল। চল, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ভদ্রলোক।'

'পাগলা না হলেই ভাল!' বিড়বিড় করল মুসা। এগোল গোয়েন্দাপ্রধানের পিছু পিছু। 'আর হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। মমির কথা শুনলে আমিও পাগল হয়ে যাব...'

প্রফেসর বেনজামিন উত্তেজিত। চত্বরে ইজি চেয়ারে বসে আছেন পিঠ সোজা করে। সামনে টেবিলে কফির কাপ। পাশে দাঁড়িয়ে আছে খানসামা।

'হুপার,' বললেন প্রফেসর। 'সত্যি শুনেছ তো?'

'মনে তো হল, স্যার,' জবাব দিল খানসামা। 'দাঁড়িয়ে ছিলাম ঘরটায়।

অন্ধকার। হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ…কথা বলার আওয়াজই হবে, শুনলাম!'

'তারপর?'

'আমার মনে হয়, ইঁদুর-টিঁদুর, স্যার,' প্রফেসরের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল হুপার। শূন্য কাপটা তুলে নিল টেবিল থেকে। ন্যাপকিন এগিয়ে দিল।

ঠোঁট মুছলেন প্রফেসর। 'কিছু একটা হয়েছে আমার, হুপার! হঠাৎ গতরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। দুরুদুরু করছিল বুকের ভেতর। কেন, কে জানে! হয়ত…হয়ত রহস্যটা আমার স্নায়ু দুর্বল করে দিয়েছে।'

'আমারও খুব অস্বস্তি লাগছে, স্যার,' বলল হুপার। 'আপনার কি মনে হয়…,' থেমে গেল কথা শেষ না করেই।

'মনে হয়? কি মনে হয়? বল?'

'ইয়ে…মানে…বলছিলাম কি, রা-অরকনকে আবার মিশরে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়? কায়রোর সেই জাদুঘরে? বেঁচে যেতেন…'

'না!' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'মাঝপথেই হাল ছেড়ে দেয়া আমার স্বভাব নয়। তাছাড়া সাহায্য আসছে।'

'গোয়েন্দার কথা বলছেন তো, স্যার? ওদেরকে বলা উচিত হবে না। পুলিশের কানে কথাটা যাওয়া কি ঠিক?'

'পুলিশের কানে যাবে না। আমার বন্ধু, ডেভিস কথা দিয়েছে। দাম আছে তার কথার…।' কলিং বেলের সুরেলা শব্দে থেমে গেলেন প্রফেসর, 'ওই যে, এসে গেছে ওরা। হুপার, জলদি যাও। নিয়ে এস ওদেরকে এখানে।'

'যাচ্ছি, স্যার,' তাড়াহুড়ো করে চলে গেল খানসামা। একটু পরেই তিন গোয়েন্দাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

ভুরু কুঁচকে বসে আছেন প্রফেসর। সেটা লক্ষ্য করল কিশোর। বুঝলে তিনটে কিশোরকে আশা করেননি তিনি। ভারিক্কি চালে পকেট থেকে কার্ড বের করে বাড়িয়ে কার্ডটা দিল সে।

যন্ত্রচালিতের মত হাত বাড়িয়ে কার্ডটা নিলেন প্রফেসর। চোখ নামালেন কার্ডের দিকে। ছাপা রয়েছেঃ

???

তিন গোয়েন্দা

প্রধানঃ কিশোর পাশা

সহকারীঃ মুসা আমান

নথিরক্ষক ও গবেষকঃ রবিন মিলফোর্ড

আর সবাই যা করে, সেই একই প্রশ্ন করলেন প্রফেসর বেনজামিনওঃ প্রশ্নবোধকগুলো কেন?

জানাল কিশোরঃ ওগুলো রহস্যের প্রতীকচিহ্ন।

'হুঁম্‌ম্‌!' কার্ডটা হাতে নিয়ে চিন্তিত ভঙ্গিতে ওল্টাচ্ছেন পালটাচ্ছেন প্রফেসর। 'ডেভিস পাঠিয়েছে তোমাদেরকে। ওর ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস, কাজেই তোমাদের ওপর ভরসা রাখছি আপাতত। পুলিশকে ডেকে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু, অসুবিধা আছে। ওরা আমার কথা বিশ্বাস করবে না। জোরজার করি যদি বেশি, একজন ডিটেকটিভ পাঠাবে। লোকের নজরে পড়বেই ব্যাপারটা; খোঁজখবর শুরু করবে ওরা। আসল খবরটা ঠিক বের করে নেবে। পাগল খেতাব দিয়ে বসবে আমাকে।'

উঠলেন প্রফেসর। 'এস, রা-অরকনকে দেখাব,' বলেই হাঁটতে শুরু করলেন বাঁ প্রান্তের দিকে।

প্রফেসরকে অনুসরণ করল কিশোর। রবিন আর মুসাও পা বাড়াতে যাচ্ছিল, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে ঠেকাল হুপার। হাতটা কাঁপছে। চেহারা ফ্যাকাসে, উত্তেজিত ভাবভঙ্গি।

অনেকখানি এগিয়ে গেছেন প্রফেসর আর কিশোর। সেদিক থেকে চোখ ফেরাল হুপার। ফিসফিস করে বলল, 'ছেলেরা, মমিটা নিয়ে কাজ শুরু করার আগে কিছু কথা জানা দরকার তোমাদের।'

'কি কথা?' ভ্রূকুটি করল মুসা।

'একটা অভিশাপ রয়েছে,' কণ্ঠস্বর আরও খাদে নামাল হুপার। 'রা-অরকনের কবরে কিছু মাটির ফলক পাওয়া গেছে। তাতে অভিশাপ বাণী লেখাঃ যে এই কবরের গোপনীয়তা নষ্ট করবে তার ওপর নামবে রা-অরকনের অভিশাপ। অনেক বছর আগে পাওয়া গেছে মমিটা। উদ্ধার অভিযানে যারা ছিল তাদের অনেকেরই অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। কারও কারও মৃত্যু ছিল ভয়ঙ্কর আকস্মিক। প্রফেসর বেনজামিনও জানেন ব্যাপারটা। কিন্তু বিশ্বাস করেন না, বলেন মমিটা না পেলেও ঘটত ওই মৃত্যু। বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা নেই এর কুসংস্কার। এতদিন এড়িয়েই ছিলেন, কিন্তু মমিটা ঘরে আনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল গণ্ডগোল। ফিসফিস করে নাকি কথা বলে ওটা! তারমানে মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেছে প্রফেসরের। কোনদিন আত্মহত্যা করে বসবেন, কে জানে! তোমরা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে চাইছ, দেখ, বাধা দেব না। তবে খুব সাবধান!'

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। হুপারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বাড়ির প্রান্তে পৌঁছে গেছে কিশোর, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'কি হল তোমাদের? এস।'

দ্রুত এগিয়ে গেল রবিন আর মুসা। গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে সঙ্গে এগোল।

বিশাল জানালা দিয়ে জাদুঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। কফিনটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রফেসর। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন পাশে। বললেন, 'এই যে, রা-অরকনের মমি। ও কি বলার চেষ্টা করেছে, আশা করি জানতে পারবে তোমরা।

বলতে পারবে আমাকে।'

গভীর প্রশান্তিতে যেন কফিনের ভেতর ঘুমিয়ে রয়েছে মেহগনি রঙের মমিটা। চোখের পাতা বোজা, কিন্তু দেখে মনে হয় যে-কোন মুহূর্তে মেলবে।

মমিটার ওপর তীক্ষ্ণ নজর বোলাল কিশোর। চোখেমুখে কৌতূহল।

রবিন আর মুসাও দেখছে, তবে কৌতূহলী বা আগ্রহী মনে হচ্ছে না তাদের। বরং শঙ্কা ফুটেছে চেহারায়। চাওয়া চাওয়ি করল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'ইয়াল্লা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'একেবারে জ্যান্ত! ড্রাকুলা জাতীয় কোন ভূত! কিশোর, এবার সত্যি সত্যি ভূতের পাল্লায় পড়ব!'

পাঁচ

গভীর মনোযোগে মমিটাকে পর্যবেক্ষণ করছে কিশোর। পাশে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে বার বার কপালের ঘাম মুছলেন প্রফেসর।

'হুপার,' খানসামাকে দেখেই বলে উঠলেন প্রফেসর, 'সবগুলো জানালা খোল! বলেছি না, আমি বন্ধ ঘর একেবারে সইতে পারি না।'

'এই যে স্যার, দিচ্ছি,' তাড়াহুড়া করে একটা জানালার দিকে এগিয়ে গেল লম্বা লোকটা। খুলে দিল জানালা। এক ঝলক বাতাস এসে ঢুকল ঘরে। দেয়ালে ঝোলানো মুখোশগুলোকে নাড়িয়ে দিল। অদ্ভুত একটা খসখস আর টুংটাং আওয়াজ উঠল চারপাশ থেকে।

শব্দ শুনে মুখ তুলল কিশোর। 'প্রফেসর, ওই শব্দ শোনেননি তো? বাতাসে মুখোশ কিংবা আর কিছু নড়ানর শব্দ?'

'না না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'মানুষের কণ্ঠস্বর চিনতে পারি না ভাবছ? মমিটার কথা বলেছিল!'

'তাহলে,' বলল কিশোর, 'ধরে নিচ্ছি, আপনি সত্যিই মমিকে কথা বলতে শুনেছেন, এবং সম্ভবত প্রাচীন আরবীতে, তাই না?'

'এখানে কি আর করার আছে, স্যার আমার?' মাঝখান থেকে বলে উঠল হুপার। 'অনেক কাজ পড়ে আছে। যাব?'

সবক'টা চোখ ঘুরে গেছে খানসামার দিকে। হঠাৎই তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে দেখল সবাই। শঙ্কিত। প্রফেসরকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল হুপার। তাঁকে নিয়ে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। পর মুহূর্তেই দুমম্ করে পড়ল কাঠের ভারি মূর্তিটা শেয়ালমাথা দেবতা আনুবিস। মুহূর্ত আগে প্রফেসর যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক সেখানে। পাশে কাত হয়ে গেল মূর্তি মুখ প্রফেসরের দিকে। তাঁকে শাসাচ্ছে যেন নীরবে।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর।

হুপারও উঠল। সে আরও বেশি কাঁপছে। 'আমি···আমি ওটাকে নড়ে উঠতে দেখেছিলাম, স্যার!' গলা কাঁপছে। 'ভর্তা হয়ে যেতেন এতক্ষণে।' ঢোক গিলল খানসামা। 'রা-অরকনের অভিশাপ, আর কিছু না! মমিটার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হয়েছে।'

'আরে দূর!' হাত দিয়ে ঝেড়ে হাতের ধুলো পরিষ্কার করছেন প্রফেসর। 'যত্তোসব কুসংস্কার! আর ওই খবরের কাগজওয়ালারা হয়েছে একেকটা গপ্পোবাজ। কিছু একটা পেলেই হল। রঙ চড়িয়ে সাতখান করে বাড়িয়ে লিখে খালি কাগজ বিক্রির ফন্দি। এমন ঘটনা আরও ঘটেছে তুতা নখামোনের মমি আবিষ্কার করার পর। অনেকেই মরল, অথচ কি সুন্দর বেঁচে গেলেন হাওয়ার্ড কার্টার। নাটের গুরু তিনি, অভিশাপে মরলে তাঁরই সবার আগে মরার কথা ছিল। তাঁর তো স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছে। ওসব আবোল তাবোল কথা বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মূর্তিটা পড়েছে অন্য কোন কারণে, অভিশাপের জন্য নয়। হয়ত ঠিকমত দাঁড় করানো হয়নি। বাতাসে পড়ে গেছে।'

'স্যার, ভুলে যাচ্ছেন,' খসখসে শোনাল হুপারের কণ্ঠ। 'তিন হাজার বছর ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তিটা, পড়েনি। আজ হঠাৎ করে পড়তে গেল কেন? আপনি ভর্তা হয়ে মরতেন, লর্ড কার্নারভনের···'

'লর্ড কার্নারভন অসুখে মরেছিলেন,' তপ্তকণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'মূর্তি পড়ে ভর্তা হয়নি। যাও, ভাগ এখন।'

'যাচ্ছি, স্যার,' ঘুরে দাঁড়াল হুপার।

ঝুঁকে মূর্তিটা দেখছিল কিশোর, মাথা তুলল। থামাল খানসামাকে। 'হুপার, আপনি বললেন মূর্তিটাকে নড়ে উঠতে দেখেছেন। কিভাবে কোন্‌দিকে নড়েছিল?'

'নাক বরাবর সামনের দিকে পড়তে লাগল, মাস্টার পাশা, টলে উঠেছিল প্রথমে,' জবাব দিল হুপার। 'আজ দাঁড়ানর ভঙ্গিতেই কেমন গোলমাল ছিল, খেয়াল করেছি! সামান্য নাড়া লাগলেই পড়ে যাবে, এমন ভঙ্গি। যেন আগে ভাগেই প্ল্যান করে রেখেছিল, আজ প্রফেসর সাহেবের ওপর পড়বে!'

'হুপার!' তীক্ষ্ণ শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ।

'সত্যিই বলছি, স্যার। টলে উঠল আনুবিস, সামনে ঝুঁকে পড়ে গেল। সময়মত নড়তে পেরেছিলাম, তাই রক্ষে!'

'হ্যাঁ, খুব ভাল করেছ। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ,' তীক্ত কণ্ঠে বললেন প্রফেসর। 'সব বাজে কথা! অভিশাপ···'

একটা ধাতব মুখোশ খসে পড়ে তীক্ষ্ণ ঝনঝন শব্দ তুলল। প্রায় লাফিয়ে উঠল ঘরের সবাই। চমকে ফিরে তাকাল ওরা।

'দেখলেন!···দেখলেন তো, স্যার!' আতঙ্কে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন হুপারের চোখ।

'বাতাস!' গলায় আর তেমন জোর নেই প্রফেসরের। 'বাতাসই ফেলেছে আনুবিসকে, মুখোশটাও ফেলল।'

হাঁটু গেড়ে কাঠের মূর্তিটার পাশে বসে পড়েছে কিশোর। হাত বোলাচ্ছে তলার চারকোনা জায়গাটায়--যার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল মূর্তি? 'যথেষ্ট ভারি মূর্তি, স্যার,' মুখ না তুলেই বলল কিশোর। 'তলাটাও খুব মসৃণ। সহজে নড়ার কথা নয়। এই মূর্তি বাতাসে ফেলতে হলে ঝড়ো বাতাস দরকার।'

'ইয়ং ম্যান,' বিরক্তই শোনাল প্রফেসরের কণ্ঠ, 'আমি একজন বিজ্ঞানী। ভূতপ্রেত কিংবা অভিশাপে বিশ্বাস করি না। আমাকে সহায়তা করতেই যদি চাও, কথাটা মনে রেখে এগিয়ো।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'আমিও ওসব বিশ্বাস করি না, স্যার। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে দুটো অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল, পাঁচজোড়া চোখের সামনে। এবং কারণটা বোঝা যাচ্ছে না—কেন পড়ল ওগুলো।'

'দৈবক্রমে পড়ে গেছে,' বললেন প্রফেসর। 'এটা নিয়ে এত মাথা ঘামানর কিছু নেই। ইয়ং ম্যান, তুমি বিশ্বাস করছ মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলেছে! কি করে বলব, কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'পারব, স্যার।'

'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা? আবোল-তাবোল কিছু নয়?'

'বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা,' দুই সহকারীর দিকে ফিরল কিশোর। 'মুসা, রবিন, গাড়িতে যে ব্যাগটা রয়েছে, ওটা আনতে হবে। কিছু যন্ত্রপাতি আছে ওতে। ওগুলো দরকার।'

'নিয়ে আসছি,' বলল মুসা। বেরিয়ে যেতে পারছে বলে খুশিই সে। 'রবিন, এস।'

'পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব আপনাদেরকে, আসুন,' হুপারও বেরিয়ে যাওয়ার ছুঁতো পেল।

বেরিয়ে এল তিনজনে, জাদুঘরে কিশোর আর প্রফেসরকে রেখে।

লম্বা একটা হলঘরের ভেতর দিয়ে চলেছে হুপার। অনুসরণ করছে দুই গোয়েন্দা। অন্য পাশের দরজা খুলল খানসামা। তিনজনে বেরিয়ে এল বাইরে।

গাড়ির বনেট মুছছে ড্রাইভার।

'ছেলেরা,' ফিসফিস করে বলল হুপার, 'প্রফেসর বেনজামিন বড় বেশি একরোখা। অভিশাপ রয়েছে, ওটাকে গ্রাহ্যই করতে চাইছেন না। কিন্তু তোমরা তো দেখলে, কি ঘটল! পরের বার হয়ত খুন হবেন তিনি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাদের কেউও হয়ে যেতে পারি! প্লীজ, ওঁকে বোঝাও, রা-অরকনকে মিশরে ফেরত পাঠিয়ে দিতে।' হলরুমে ঢুকে গেল আবার খানসামা।

রবিন আর মুসা, দু'জনেই খুব চিন্তিত।

'অভিশাপ-টাপ বিশ্বাস করে না কিশোর,' বলল মুসা। 'আমি করি, তাও বলব না। তবে একটা কথা শিওর হয়ে বলতে পারি; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে কেটে পড়া উচিত আমাদের।'

কোন জবাব দিতে পারল না রবিন। ওসব অভিশাপ-টাপে তারও বিশ্বাস নেই। কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো তো ঘটছে, এর কি ব্যাখ্যা?

পেছনে শব্দ শুনে ফিরে তাকাল ড্রাইভার। 'হয়েছে আপনাদের? না আরও দেরি আছে?'

'মাত্র শুরু করেছি, এখনও অনেক দেরি,' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'যে কারবারে জড়িয়েছি!...ব্যাগটা নিতে এলাম।'

ঘুরে গাড়ির পেছন দিকে চলে এল ড্রাইভার। ট্রাঙ্ক খুলে বের করে আনল চামড়ার চ্যাপ্টা ব্যাগটা। বাড়িয়ে দিল মুসার দিকে, 'এই যে, নিন।'

'আছে কি এর ভেতরে?' ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলল মুসা। 'যা ভারি! রবিন, কিশোর একটা চমক দেবে মনে হচ্ছে!'

'দেখ কি আবার করে বসে!' চিন্তিত দেখাচ্ছে রবিনকে। 'টায়ার পাঙ্কচারের ডিডাকশন করে তো খুব একহাত নিয়েছ, পাল্টা আঘাত হেনে না একেবারে কাত করে দেয়।'

ব্যাগটা নিয়ে আবার জাদুঘরে গিয়ে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। আনুবিসকে তুলে আবার জায়গামত দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কিশোর আর প্রফেসর। মূর্তিটাকে আরও ইঞ্চিখানেক পেছনে ঠেলে দিল কিশোর। মাথা নাড়ল। 'না, আপনাআপনি পড়তেই পারে না। জানালা দিয়ে বাতাস যা আসছে এতে তো পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। পড়াতে হলে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস লাগবে।'

ঘন ভুরু জোড়া কাছাকাছি চলে এল প্রফেসরের। 'আধিভৌতিক কোন শক্তি কাজ করছে এর পেছনে, বলতে চাইছ।'

'জানি না! মূর্তিটা কি করে পড়ল, আপাতত বলতে পারছি না,' শান্ত কণ্ঠ কিশোরের। রবিন আর মুসার ওপর চোখ পড়তেই বলল, 'কিন্তু মমি কি করে কথা বলে, দেখাচ্ছি।'

মুসার হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে খুলল কিশোর। ভেতর থেকে বের করল বড় আকারের তিনটে ট্রানজিসটর রেডিও। একটা রেডিও তুলে দিল মুসার হাতে। ব্যাগ থেকে একটা চামড়ার বেল্ট বের করে পরিয়ে দিল মুসার কোমরে। তামার অসংখ্য সরু সরু তার কায়দা করে লম্বালম্বি আটকানো রয়েছে বেল্টে। রেডিও থেকে বের করে রাখা দুটো তারের মাথা প্লাগ দিয়ে আটকে দিল বেল্টের তারের সঙ্গে। 'জানালা দিয়ে চত্বরে নাম, তারপর বাগানে চলে যাও,' সহকারীকে নির্দেশ দিল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কানের কাছে রেডিওটা তুলে ধরে রাখবে, যেন কিছু শোনার

চেষ্টা করছ। পাশে, এই যে এই বোতামটা টিপে রাখবে। ঠোঁট যতটা সম্ভব না নেড়ে কথা বলবে। শোনার দরকার হলে বোতামটা টিপে অন করে দেবে, ব্যস তাহলেই হবে।'

'কি এটা?' জানতে চাইল মুসা।

'ওয়াকি-টকি। বেল্টটা অ্যান্টেনা। সিটিজেন ব্যাণ্ডে খবর পাঠানো এবং ধরার রেঞ্জ আধ মাইল। আমাদের নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রাখার একটা ব্যবস্থা। গত হপ্তায় আর্মির ফেলে দেয়া বাতিল কিছু জিনিস কিনে এনেছিল চাচা। তার ভেতর ছিল এরকম পাঁচটা জিনিস। তিনটে সরিয়ে নিয়েছি আমি।'

'আমি বাগানে যাচ্ছি,' বলল মুসা। 'কি কথা বলব?'

'যা খুশি। জানালা গলে চত্বরে নাম, তারপর বাগান।'

'ঠিক হ্যায়,' পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল মুসা। ঝট করে চোখ তুলে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে। রক্ত জমেছে মুখে। 'তাহলে এই তোমার মাইণ্ড রিডিং?'

'ওসব নিয়ে পরে আলাপ করব,' হাসছে কিশোর। 'এখন প্রফেসরকে ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। কথা শুরু কর,' বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে বড় একটা জানালার কাছে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিল নিচে। 'দেয়ালের ধার ধরে চলে যাও। ওই যে, গেটপোস্টের ওপরে বড় পাথরের বলটা বসানো রয়েছে ওদিকে।'

'যাচ্ছি!' জানালা পেরিয়ে চত্বরে নামল মুসা। কানের কাছে তুলে রেখেছে রেডিও।

'প্রফেসর,' বলল কিশোর, 'মমিটা ছুঁলে কোন অসুবিধা হবে?'

'না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'তবে বেশি নড়াচড়া কোরো না।'

মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। পরমুহূর্তেই সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতে একটা ওয়াকি-টকি, অন্যটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাতেরটা মুখের কাছে এনে বলল, 'হ্যাঁ, এবার কথা শুরু কর, মুসা। প্রফেসর, শুনবেন। রবিন, তুমিও শোন।'

সবাই কান খাড়া রাখল। নীরবতা। তারপর একটা মৃদু বিড়বিড় শোনা গেল।

'মমির ওপর ঝুঁকে দাঁড়ান,' প্রফেসরকে বলল কিশোর। কানের কাছে ধরা রয়েছে তার ওয়াকি-টকি।

ভ্রূকুটি করলেন প্রফেসর। ঝুঁকলেন মমির ওপর। রবিনও ঝুঁকল। ফিসফিসে কথা শোনা যাচ্ছে কফিনের ভেতর থেকে। দু'জনের কারোই বুঝতে অসুবিধে হল না, ওটা মুসার কণ্ঠস্বর।

'গেট পেরিয়ে এসেছি,' বলল মুসা। 'ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছি বড় ঝোপটার কাছে।'

'যেতে থাক,' বলল কিশোর। ঘরের অন্য দু'জনের দিকে ফিরল। 'দেখলেন তো, প্রফেসর, মমিকে কথা বলানো কত সহজ?'

মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। আলগা লিনেনের নিচ থেকে বের করে আনল তৃতীয় ওয়াকি-টকিটা। ওটা থেকেই আসছে মুসার কণ্ঠস্বর। যেন মমিই কথা বলছে।

'বৈজ্ঞানিক সমাধান, স্যার,' প্রফেসরকে বলল কিশোর। 'মমির লিনেনে ছোট একটা রেডিও রিসিভার লুকিয়ে রাখা যায় সহজেই। বাইরে থেকে কেউ...' থেমে গেল সে।

'আরে!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মুসার কণ্ঠ। 'ঝোপের ভেতর কে জানি লুকিয়ে আছে!...একটা ছেলে! ও জানে না, আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি। ধরবে ওকে।'

'দাঁড়াও!' বলে উঠল কিশোর। 'আমরা আসছি। একা যেয়ো না।'

'তোমরা বেরোলেই হয়ত দেখে ফেলবে,' শোনা গেল মুসার কণ্ঠ। 'আমিই যাচ্ছি। ওর পথ আটকে জানাব তোমাদের। সঙ্গে সঙ্গে ছুটবে।'

'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। 'ওকে ধরেই চেঁচিয়ে উঠবে। ছুটে আসব আমরা।' প্রফেসরের দিকে ফিরল সে। 'ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে একজন। ওকে ধরতে পারলে হয়ত রহস্যটার সমাধান হয়ে যাবে।'

নীরবতা।

'এতক্ষণ কি করছে ও!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল রবিন। 'কিছুই বলছে না মুসা! দেখাও যাচ্ছে না এখান থেকে!'

আবার নীরবতা। অপেক্ষা করছে ওরা।

পা টিপে টিপে এগোচ্ছে মুসা। কানের কাছেই ধরা রয়েছে রেডিও। ঝোপের মধ্যে পেছন ফিরে বসে বাড়ির সামনের দিকে নজর রাখছে লোকটা। ঝোঁপের একেবারে কাছে চলে এল মুসা। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। তারপর প্রায় ডাইভ দিয়ে ঢুকে গেল ঝোপের ভেতরে। ঝোপঝাড় ভেঙে ছেলেটাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে। উপুড় হয়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়েছে ছেলেটা। তার ওপর মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'জলদি এস! ওকে ধরেছি!'

কথা বলে উঠল ছেলেটা। বিদেশী ভাষা। এক বর্ণ বুঝল না মুসা। ধস্তাধস্তি করছে ছেলেটা। তাকে জোর করে চেপে ধরে রেখেছে। হঠাৎ ছেলেটার হাতের আঘাতে মুসার হাত থেকে ছুটে পড়ে গেল রেডিও। ওটা তোলার চেষ্টা না করে দু'হাতে ছেলেটাকে জাপটে ধরল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল দু'জনে।

প্রায় মুসারই সমবয়েসী হবে ছেলেটা। লম্বা-চওড়ায় কিছুটা কম, তবে গায়ের জোর কম না। কায়দা-কৌশলও জানে মোটামুটি। বান মাছের মত পিছলে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে মুসার আলিঙ্গন থেকে। একবার ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু খাড়া হওয়ার আগেই আবার তাকে ধরে ফেলল মুসা। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে গিয়ে একটা পাথরের দেয়ালে ঠেকে গেল দু'জনে। আবার কথা বলে উঠল ছেলেটা।

কিছুই বুঝল না মুসা। বোঝার চেষ্টাও করল না। তার একমাত্র চিন্তা, ছেলেটাকে আটকে রাখতে হবে রবিন আর কিশোর না পৌঁছানো পর্যন্ত।

ওয়াকি-টকিতে মুসার চিৎকার শুনেই দরজার দিকে দৌড় দিল রবিন। তার পেছনে কিশোর ও প্রফেসর বেনজামিন।

সদর দরজায় বেরিয়েই দেখতে পেল, তাদের আগে ছুটছে আরেকজন লোক। নীল ওভারঅল পরা। ছুটতে ছুটতেই বেলচাটা ফেলে দিয়েছে হাত থেকে।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

প্রফেসর বললেন, 'মালী।'

ঢাল বেয়ে নামতে নামতে দেখল ওরা, ছেলে দুটোর কাছে পৌঁছে গেছে মালী। মুসাকে সরিয়ে দিয়ে অন্য ছেলেটার গলা চেপে ধরল। টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, গলা ছাড়ল না।

উঠে দাঁড়াল মুসা। হাত-পায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল। মালীর দিকে চেয়ে বলল, 'শক্ত করে ধরুন। ওটা একটা বনবেড়াল!'

দুর্বোধ্য ভাষায় আবার কিছু বলে উঠল ছেলেটা। গলায় মালীর হাত, গোঁ গোঁ করে এক ধরনের চাপা শব্দ বেরোল কথার সঙ্গে।

বিদেশী ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল মালী, ছেলেটার কথার জবাব দিচ্ছে বোধহয়। মাঝপথেই আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই ছুটল ছেলেটা। ঢাল বেয়ে ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ল আরেকটা ঝোপে। আর ধরা যাবে না ওকে। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়েই রয়েছে মুসা।

ঠিক এই সময় পৌঁছে গেল রবিন, কিশোর আর প্রফেসর।

'কি হল?' মালীর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। 'তোমার হাত থেকে ছুটল কি করে ছেলেটা?'

প্রফেসরের দিকে ফিরল মালী, 'হাতে কামড়ে দিয়েছে, স্যার!' ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল সে। কব্জির নিচে চামড়ায় দাঁতের দাগ, রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

'এত বড় দেহটা রেখেছ কেন!...একটা বাচ্চা ছেলেকে...'

'ও কামড়ে দেবে, বুঝতে পারিনি, স্যার।'

'হুঁ! যাও, জলদি ওষুধ লাগাও। দাঁতে বিষাক্ত কিছু থাকতে পারে। ইনফেকশন হলে বুঝবে ঠেলা। জলদি যাও।'

ঘুরে দাঁড়াল মালী। মাথা নিচু করে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

'লোকটা রিগো কোম্পানিতে কাজ করে,' কিশোরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দেখে বললেন প্রফেসর। 'বাগানের কাজের চুক্তি নেয় কোম্পানিটা। খুব ভাল ভাল মালী আছে ওদের। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার অনেকেই নিয়মিত ডাকে।'

এখনও হাঁফাচ্ছে মুসা। 'হায়-হায়রে! খামোকাই কষ্ট করলাম! ব্যাটা ছেড়ে

দেবে জানলে আমিই ধরে রাখতাম!'

'কিন্তু ছেলেটা কে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কি করেছিল এখানে?'

'ঝোপে বসে প্রফেসরের বাড়ির দিকে চোখ রাখছিল,' বলল মুসা। 'নড়েচড়ে উঠেছিল, তাই দেখে ফেলেছিলাম।'

'অনেক কিছু জানাতে পারত সে আমাদেরকে!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'ছেলেরা,' বললেন প্রফেসর। 'ব্যাপার-স্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে...'

তিন জোড়া চোখ ঘুরে গেল তাঁর দিকে।

'...তবে, মুসার চিৎকারের পর পরই কয়েকটা শব্দ কানে এসেছে। বোধহয় ছেলেটাই বলেছে।'

'কিছুই বুঝিনি,' বলল মুসা। 'বিদেশী ভাষা।'

'আধুনিক, আরবী,' বললেন প্রফেসর। 'কি বলেছে জান? বলেছেঃ হে মহান রা-অরকন দয়া করে সাহায্য করুন আমাকে!'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল কিশোর, থেমে গেল মুসার চিৎকারে, 'হুঁশিয়ার!' হাত তুলে নির্দেশ করছে একটা দিক।

নিমেষে সব ক'টা চোখ ঘুরে গেল সেদিকে।

বড় গেটটার দু'পাশে দুটো মোটা থাম, মাথায় বসানো দুটো গ্রানাইটের বিশাল বল। কি করে জানি খসে পড়ে গেছে একটা। বিপজ্জনক গতিতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে ওদের দিকে। গতি বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

ছয়

ছুট লাগানর জন্যে তৈরি হয়েছে রবিন আর মুসা। থেমে গেল প্রফেসরের তীক্ষ্ণ চিৎকারে। 'খবরদার! এক চুল নড়বে না কেউ!'

প্রফেসর বেনজামিনের প্রতি কিশোরের শ্রদ্ধা বাড়ল। বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর, কড়া নজর। তার আগেই প্রফেসর অবস্থাটা মনে মনে জরিপ করে নিয়েছেন। বলটা ওদের গায়ে পড়বে না, চলে যাবে পাশ দিয়ে।

লাফিয়ে গড়িয়ে ওদের দশ ফুট দূর দিয়ে চলে গেল বলটা। নিচের কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছে গিয়ে ধাক্কা খেল প্রচণ্ড শব্দে।

'সেরেছিল।' কপালের ঘাম মুছল রবিন। 'ওদিকেই রওনা হয়েছিলাম আমি, ভর্তা হয়ে যেতাম!'

'আমি হতাম না,' বলল মুসা। 'উল্টো দিকে লক্ষ্য ছিল আমার। ওজন কত হবে? এক টন?'

'বেশি হবে,' বললেন প্রফেসর। 'গ্র্যানাইটের বল, এক ঘন-ফুটে ওজন হবে···দাঁড়াও, অঙ্ক কষে···'

'প্রফেসর!'

কথা থামিয়ে ফিরলেন প্রফেসর। অন্য তিনজনও তাকাল। হুপার ছুটে আসছে।

কাছে এসে দাঁড়াল হুপার। হাঁপাচ্ছে। 'রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। দেখেছি! কোন ক্ষতি হয়নি তো আপনাদের?'

'না, কোন ক্ষতি হয়নি,' অস্থির কণ্ঠস্বর। হুপারের দিকে চেয়ে ঘন ভুরুজোড়া কোঁচকালেন প্রফেসর। 'কি বলবে, জানি। শুনতে চাই না ওসব আর!'

'মাফ করবেন স্যার,' তবু বলল হুপার, 'এটা রা-অরকনের অভিশাপ ছাড়া আর কিচ্ছু না! একের পর এক দুর্ঘটনা···রা-অরকন আপনাকে খুন করবে, স্যার! হয়ত আমাদের সবাইকেই করবে!'

'রা-অরকনের অভিশাপ!' বিড়বিড় করল কিশোর। প্রফেসরের দিকে ফিরল, 'প্রফেসর, মমিটা যে কবরে পেয়েছেন, ওখানে কি কোন কিছুতে অভিশাপের কথা লেখা ছিল?'

'না, মানে···ইয়ে···হ্যাঁ···'

প্রফেসরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল হুপার, 'ছিল! লেখা ছিলঃ যে এই কবরের পবিত্রতা আর শান্তি বিনষ্ট করবে, তার ওপর নেমে আসবে রা-অরকনের অভিশাপ! কবর খোঁড়ার কাজে যারা সহায়তা করেছিল, তাদের অনেকেই মরেছে। সাতজন···'

'হুপার!' গর্জে উঠলেন প্রফেসর। 'খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ!'

'মাফ করবেন, স্যার, দুঃখিত,' চুপ হয়ে গেল খানসামা।

লজ্জিত হলেন প্রফেসর। কিশোরের দিকে চেয়ে বললেন, 'একেবারে মিথ্যে বলেনি হুপার। রা-অরকনকে ঘিরে সত্যিই কিছু রহস্য গড়ে উঠেছে। একটা পাথরের পাহাড়ের চূড়ার কাছে ছিল ওর কবর। কবরটা লুকানো ছিল ভালমত। রাজকীয় কবর, অথচ মূল্যবান কিছু পাওয়া যায়নি সমাধিকক্ষে। শুধু সাধারণ একটা কফিনে রা-অরকন আর তার আদরের পোষা বেড়ালটার মমি। তবে, ও রা-অরকন কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু কফিনের গায়ে ছাড়া কবরটার আর কোথাও তার নাম লেখা নেই, ফারাওদের কোন চিহ্ন নেই। যদি সে রা-অরকন হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষ কোন কারণে ওরকম সাধারণ ভাবে কবর দেয়া হয়েছিল তাকে। সমাধিকক্ষটা দেখে যা মনে হয়েছে, প্রাচীন দস্যু-তস্করেরা ঢুকতে পারেনি ওখানে। আর যদি ঢুকে থাকেও, তাহলে নিশ্চয়ই খুব হতাশ হতে হয়েছিল তাদেরকে। কিচ্ছু পায়নি।'

'অভিশাপের কথা কোথায় লেখা ছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কয়েকটা মাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে, তাতে। মমিটা কবর থেকে বের করে আনার পরের দিনই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে আমার প্রধান সহকারী। তার পরের দিন কায়রোর বাজারে খুন হল আমার সেক্রেটারি। একই জায়গায় প্রায় একই সময় খুন হল আরও একজন। সে-ও আমার সহকারী ছিল, বন্ধুও। জিম উইলসনের বাবা যে শ্রমিকেরা খুঁড়েছিল, তাদের ওভারশিয়ার। মারা গেল সাপের কামড়ে। সব ক'টাই দুর্ঘটনা! এর মধ্যে কোন রহস্য নেই। মোটর দুর্ঘটনা, খুনখারাপি, কিংবা সাপের কামড় নুতন কোন ঘটনা নয়।'

চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলেই মনে হচ্ছে ওদের।

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, অভিশাপের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই,' বললেন প্রফেসর। 'যেদিন মমিটা আমার বাড়িতে এসে পৌঁছুল সেদিনই একজন লোক এসেছিল দেখা করতে। অ্যারাবিয়ান। নাম, জলিল···কি যেন! মমিটা দিয়ে দিতে বলল। বেশ চাপাচাপি করল আমাকে। লিবিয়ার এক ধনী ব্যবসায়ী পাঠিয়েছে তাকে। জলিল ওই লোকটার ম্যানেজার। রা-অরকন নাকি ওই ব্যবসায়ী জামানের পূর্ব-পুরুষ। সেটা জেনেছে আবার এক জাদুকরের কাছে। যত্তোসব ভোগলামি! প্রথমে ভদ্রভাবে বললাম, গেল না জলিল। শেষে ব্যবহার খারাপ করতে বাধ্য হয়েছি। যাওয়ার আগে জলিল হুঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে, রা-অরকনের প্রেতাত্মা নাকি ছাড়বে না আমাকে। মমিটাকে মিশরে নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় আবার কবর না দিলে অভিশাপ নামবে আরও অনেকের ওপর।'

আবার চাওয়া চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। ব্যাপারটাকে আধিভৌতিক বলে মেনে নিতে আর কোন দ্বিধা নেই ওদের।

তবে দু'জনের মনে হল, গভীর রহস্যের সন্ধান পাওয়ায় খুশি খুশি লাগছে যেন কিশোরকে।

'এখন,' বললেন প্রফেসর। 'ওসব ফালতু চিন্তা বাদ দিয়ে এস দেখি, কেন খসে পড়ল বলটা। কারণটা জানার চেষ্টা করি।'

গেটের দিকে এগোলেন প্রফেসর। পেছনে তিন গোয়েন্দা, সবার পেছনে হুপার।

থামের মাথায় সুড়কি দিয়ে একটা খাঁজ বানানো হয়েছিল, তার ওপর বসান ছিল বলটা। আটকে দেয়া হয়েছিল সিমেন্ট দিয়ে। দীর্ঘদিন রোদ বাতাস আর বৃষ্টিতে ক্ষয়ে গিয়েছে সিমেন্ট। খাঁজের একটা দিক ভাঙা, ফলে বলটা পড়ে গেছে।

'কোন রহস্য নেই,' বললেন প্রফেসর। 'সিমেন্ট আর সুড়কি ক্ষয় হয়ে গেছে, ওই দেখ রিং ভাঙা। ঢালের দিকে সামান্য কাত হয়ে আছে থাম। হয়ত, অতি মৃদু ভূমিকম্প হয়েছিল, এতই মৃদু আমরা টের পাইনি। এটা নতুন কিছু না এ অঞ্চলে। মাঝেমধ্যেই এরকম ঘটে।'

প্রফেসরের যুক্তি মনঃপূত হল না হুপারের। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সেখান থেকে চলে গেল সে।

প্রফেসরের সঙ্গে সঙ্গে চত্বরে এসে উঠল আবার তিন গোয়েন্দা। জাদুঘরে ঢুকল। ঘিরে দাঁড়াল রা-অরকনের মমিকে।

'বুদ্ধি আছে তোমার,' কিশোরের প্রশংসা করলেন প্রফেসর। 'মরা মমি কি করে কথা বলে, একটা যুক্তি দেখাতে পেরেছ। তবে ভুল যুক্তি। কারণ, কফিনের কোথাও কোন রেডিও লুকানো নেই।'

'ভালমত দেখেছিলেন তো, স্যার?'

চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। 'নিশ্চয়। বেশ, তোমাদের সামনেই আবার দেখছি।' মমিটা কফিন থেকে বের করে নিলেন তিনি। কিশোরকে খুঁজে দেখতে বললেন।

'না, নেই রেডিও।'

এবার সত্যিই বিস্মিত হল কিশোর। 'নাহ্, নেই! ইলেকট্রনিক কোন কিছুই নেই। প্রফেসর, আমার প্রথম যুক্তি ভুল হল।'

'প্রথম যুক্তি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভুল হয়,' কিশোরকে উৎসাহ দিলেন প্রফেসর। 'তবে পরের যুক্তিটা হয়ত ঠিক হবে। ভেবে বের করে ফেল আরেকটা কিছু।'

'আপাতত পারছি না, স্যার। আচ্ছা, বললেন, শুধু যখন আপনি একা থাকেন এঘরে, তখনই মমিটা কথা বলে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝোঁকালেন প্রফেসর। 'আর বলে বিশেষ একটা সময়ে। শেষ বিকেল কিংবা সন্ধ্যায়।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'এ-বাড়িতে আপনি ছাড়া আর কে কে থাকে?'

'হুপার। দশ বছর ধরে আমার চাকরি করছে সে। তার আগে থিয়েটারে কাজ করত, অভিনেতা। সে আমার শোফার, বাবুর্চি, খানসামা। হপ্তায় তিন দিন একজন মহিলা আসে ঘরদোর পরিষ্কার করতে, তবে ও থাকে না এখানে।'

'মালীর ব্যাপারটা কি? নতুন?'

'তা জানি না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'আট বছর ধরে রিগো কোম্পানির লোক দিয়ে কাজ করাচ্ছি। একেকবার একেকজন লোক আসে। সবার চেহারা মনে রাখা সম্ভব না। তবে বাগান পর্যন্তই ওদের সীমানা। কখনও বাড়ির ভেতরে ঢোকে না।'

'হুঁম্ম্!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝোঁকাল কিশোর। ভুরু কুচকে গেছে। 'যা-ই হোক, মমিটার কথা-বলা নিজের কানে শুনতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু ও তো শুধু আমার সঙ্গে কথা বলে। হুপার কিংবা জিমের সঙ্গে বলেনি।

তোমার সঙ্গে বলবে বলেও মনে হয় না।'

'হ্যাঁ,' প্রফেসরের সঙ্গে একমত হল রবিন। 'তোমার সঙ্গে কেন কথা বলতে যাবে মমিটা? তুমি তো ওর কাছে অপরিচিত।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল মুসা। 'কথাবার্তা মোটেই সুবিধার মনে হচ্ছে না আমার। এমন ভাবে বলা হচ্ছে, যেন মমিটা সব কথা শুনতে পাচ্ছে, সব বুঝতে পারছে। ও যেন আমাদের মতই জ্যান্ত!'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন প্রফেসর। 'এসব আলোচনার কোন মানে নেই। বৈজ্ঞানিক কোন যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।'

কারও কথায়ই কান দিল না কিশোর। দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'আমার বিশ্বাস, মমিটা আমার সঙ্গে কথা বলবে। একবার কথা বললেই আরও কিছু তথ্য জোগাড় করে ফেলতে পারব আমি। প্রফেসর, বিকেলে আবার আসব আমরা। পরীক্ষা চালাব।'

'ইয়াল্লা, কিশোর কোথায়?' হেডকোয়ার্টারের দেয়ালে লাগানো ঘড়িটার দিকে চেয়ে আছে মুসা। 'আমাদেরকে ছ'টায় আসতে বলে সে নিজেই গায়েব। সোয়া ছ'টার বেশি বাজে।'

'মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে এস,' সকালের ঘটনার রিপোর্ট লিখছে রবিন। 'তিনি হয়ত কিছু বলতে পারবেন।'

'এসেই জিজ্ঞেস করছি,' বলল মুসা। 'তিনি কিছু জানেন না। বলে যায়নি কিশোর। দেখি এসেছে কিনা ও।' উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল। হাতল ধরে ঘোরাল এদিক ওদিক। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'ওই যে, এসে গেছে। শহরের দিক থেকে আসছে। ট্যাক্সিতে করে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিয়েছে। হয়ত ওয়াকি-টকিতে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।'

দ্রুত ডেস্কের কাছে চলে এল মুসা। এক কোণে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা লাউড-স্পীকার, বাক্সে ভরে। টেলিফোন লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে ওটার। মুসা কিংবা রবিন জানত না, গত হপ্তায় ওটার ওপর আরেক দফা কারিগরী চালিয়েছে কিশোর। বাক্সের মধ্যে একটা রেডিও সেট বসিয়ে যোগ করে দিয়েছে মাইক্রোফোন আর স্পীকারের সঙ্গে। সুইচ অন করা থাকলে হেডকোয়ার্টারের ভেতরের সব আওয়াজ ট্রান্সমিট করে ওটা। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে এসে কথাটা দুই বন্ধুকে জানিয়েছে কিশোর।

বাক্সটার দিকে চেয়ে মুখ বাঁকাল মুসা। 'এহ্, মাইণ্ড রিডিং! সকালে কি ফাঁকিটাই না দিয়েছে আমাদের! আমরা কি বলছি সব শুনেছে!' বিড়বিড় করতে করতে বাক্সের সামনে মুখ নিয়ে এল সে। একটা সুইচ অন করল। 'হেডকোয়ার্টার থেকে বলছি। সেকেণ্ড কলিং ফার্স্ট। সেকেণ্ড কলিং ফার্স্ট।' সুইচটা অফ করে টিপে

আরেকটা সুইচ অন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল স্পীকারে। তারপরই পরিষ্কার ভেসে এল কিশোরের গলা। 'ফার্স্ট বলছি। শিগগিরই আসছি। "সর্ব দর্শন" তুলে দিয়েছ কেন? নামাও। দরকারের সময় ছাড়া একদম তুলবে না ওটা। গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'শুনেছি, এবং বুঝতে পেরেছি,' স্পীকারের সুইচ অফ করে দিল মুসা।

পেরিস্কোপ নামাতে এগিয়ে গেছে রবিন। 'বাজ পাখির চোখ! কিচ্ছু এড়ায় না।' নামানর আগে একবার চোখ রাখল পেরিস্কোপের আয়নায়। 'গেটের কাছে থেমেছে ট্যাক্সি। কিশোর বেরিয়ে এসেছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। হাঁটতে শুরু করেছে। ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছে।' পেরিস্কোপ নামিয়ে আগের চেয়ারে এসে বসল রবিন। 'গিয়েছিল কোথায়!'

নীরব রইল মুসা। জবাবটা সে নিজেও জানে না।

এক মিনিট পেরোল···দুই···তিন···চার···পাঁচ।···দশ মিনিট পেরোল··· পনেরো···

'আসছে না কেন এখনও!' বলল রবিন। 'এতক্ষণে তো এসে পড়ার···' ট্রেলারের মেঝেতে ট্র্যাপডোরে শব্দ শুনে থেমে গেল।

খুলে গেল বোর্ডটা। একটা মাথা দেখা দিল সুড়ঙ্গের মুখে। একজন বৃদ্ধ মানুষ। কাঁচাপাকা ঘন ভুরু। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। মুখে দাড়ি।

'প্রফেসর বেনজামিন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আপনি এখানে এলেন কি করে? কিশোর কোথায়?'

'রা-অরকনের অভিশাপ নেমেছে তার ওপর,' খুদে অফিস ঘরটায় উঠে এলেন প্রফেসর। 'রা-অরকন সব উল্টে দিয়েছে। প্রফেসরকে কিশোর আর কিশোরকে প্রফেসর বেনজামিন বানিয়েছে।' টেনে মাথার সাদা উইগ খুলে ফেলল কিশোর। চশমা খুলে দরাজ হাসি হাসল দুই বন্ধুর দিকে চেয়ে। 'তোমাদেরকে যখন বোকা বানাতে পেরেছি, মমিটাকে নিশ্চয়ই পারব।'

হাঁ করে আছে রবিন। চোখ বড় বড়।

'খাইছে, কিশোর!' মুসার চোখও কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে যেন। 'দারুণ হয়েছে ছদ্মবেশ। আমরাই গাধা বনে গেছি। মমিটাকে বোকা বানানর কথা কি যেন বলছিলে?'

'পরীক্ষা নেব,' কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে উইগ আর চশমাটা ভরে ফেলল কিশোর। দাড়িটা টেনে খুলে নিয়ে ভরল। কপালে, চোখের পাতায় বিশেষ রঙিন পেন্সিলে কয়েকটা দাগ টানা হয়েছে। মাত্র কয়েকটা দাগেই অনেক বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে। 'মি. ক্রিস্টোফারের কাছে গিয়েছিলাম। একজন মেকআপ ম্যানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তিনি। ছদ্মবেশের এই উপকরণ সেই মেকআপম্যানই দিয়েছে। কি করে ছদ্মবেশ নিতে হবে, শিখিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'মমিটাকে বোকা বানাতে,' বলল কিশোর।

'সে তো বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কেন বানাবে, সেটাই জানতে চাইছি।'

'আমাকে প্রফেসর বেনজামিন বলে ভুল করলে, কথা বলবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তাই ছদ্মবেশ নিতেই হচ্ছে। আর কারও সঙ্গে তো কথা বলে না ওটা।'

'আল্লাই জানে কি বলছ! এমন ভাবে বলছ, যেন মমিটা দেখতে পায়, শুনতে পায়, চিন্তা করতে পারে! কিশোর, ওটা একটা মমি। তিন হাজার বছর আগে মারা যাওয়া একটা মানুষের শুকনো লাশ। ওটা কথা বলে! এবার সত্যিই বুঝি ভূতের পাল্লায় পড়লাম! কিশোর, এখনও সময় আছে। ভাল চাও তো, ভুলে যাও ওটার কথা। চল, বেড়ালটার ব্যাপারে তদন্ত করি আমরা। মমি রহস্যের সমাধান করতে পারব না। খামোকা বেঘোরে প্রাণটা হারাব।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন। ঢোক গিলল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'তার মানে,' মুসার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে কিশোর, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে চাও না? মমিটার কথা বলা শুনতে চাও না?'

দ্বিধা করছে মুসা। 'উত্তেজিত হয়ে অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছে, অনুশোচনা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। আস্তে মাথা নাড়ল সে। 'তাই বলতে চাইছি। কিশোর, এবার হয়ত জাদুঘরের ছাদটাই ভেঙে পড়বে আমাদের মাথায়! সকালে বড় বেশি নাছোড়বান্দা মনে হয়েছে রা-অরকনকে।'

'বেশ,' বলল কিশোর, 'আমরা মানুষ তিনজন। একই সঙ্গে একটা কাজ করতে হবে, তার কোন মানে নেই। তুমি প্রফেসরের ওখানে যেতে না চাইলে জোর করব না। মিসেস ভেরা চ্যানেলের ওখানেই যাও। বেড়ালটা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে এস। আমি আর রবিন যাচ্ছি প্রফেসরের ওখানে। কি বল, রবিন?'

রবিনও ভয় পাচ্ছে যেতে। তবে প্রচণ্ড কৌতূহলের কাছে হার মানল ভয়। মাথা কাত করল সে, যাবে।

'বেশ,' মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'আমরা ট্যাক্সি নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ইয়ার্ডের পিকআপটায় করে যাও। দেখলাম, বসে আছে বোরিস। তেমন কাজকর্ম নেই। বললে তোমার সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে যেতে পারে ও।'

দ্বিধা যাচ্ছে না মুসার। অবশেষে মনস্থির করে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে তাই যাব।' সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগিয়ে গেল।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। অফিসে তালা লাগাচ্ছে বোরিস। মুসাকে দেখে হাসল।

এক কথায় রাজি হয়ে গেল বোরিস। মুসাকে নিয়ে যাবে সান্তা মনিকায়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল মুসা, কিশোরকে দেখিয়ে দেবে এবার, গোয়েন্দাগিরিতে সে-ও কম যায় না। বেড়ালটা খুঁজে বের করবেই সে। কিন্তু খচখচও করছে মনের ভেতর, দুই বন্ধুর জন্যে। রা-অরকনের অভিশাপ যদি সত্যিই নেমে আসে কিশোর আর রবিনের ওপর?

সাত

জাদুঘরে একা ঢুকল কিশোর। মাথার ওপরের আলোটা জ্বেলে দিল। বাইরে এখনও দিন। সূর্য অস্ত যায়নি, তবে খাড়া পাহাড়গুলোর আড়ালে চলে গেছে। ফলে অন্ধকার নেমে এসেছে গিরিখাতে। গাঢ় ছায়া গিলে নিয়েছে যেন বিশাল পুরানো বাড়িটাকে।

বুড়ো মানুষের মত ধীরে সুস্থে নড়াচড়া করছে কিশোর, অবিকল প্রফেসর বেনজামিনের নকল। বড় জানালাগুলো খুলে দিল। তারপর গিয়ে দাঁড়াল কফিনটার সামনে। ঢাকনা তুলে দাঁড় করিয়ে রাখল একপাশে। একনজর দেখল মমিটাকে। ঝুঁকল ওটার ওপর। জোরে জোরে বলল, 'রা-অরকন, কথা বলুন। আমি শুনছি।'

ভাল অভিনেতা কিশোর। গলার স্বরও পুরোপুরি নকল করেছে। প্রফেসরের কোট আর টাই পরেছে। শার্টের তলায় আলগা কাপড় তোয়ালে দিয়ে বেঁধে ভুঁড়ি তৈরি করেছে। খুব কাছে থেকে কেউ না দেখলে বুঝতেই পারবে না ব্যাপারটা। চোখ বন্ধ রেখে রা-অরকনের মমি নিশ্চয় ধরতে পারবে না এই ফাঁকি, আশা করছে কিশোর।

রবিন আর প্রফেসর বেনজামিন অপেক্ষা করছেন পাশের ঘরে। হুপার রান্নাঘরে ব্যস্ত। কি ঘটছে না ঘটছে, কিছুই জানে না। নীরব রয়েছে মমি।

'মহান রা-অরকন,' আবার বলল কিশোর, 'কথা বলুন। আমি বোঝার চেষ্টা করব।'

কি যেন শোনা গেল? মাথা কাত করে মমির ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল কিশোর। অদ্ভুত খসখসে কণ্ঠস্বর। হিসহিস আর ফিসফিসানিতে ভরা। আরও কিছু অদ্ভুত শব্দ মিশেছে। শব্দগুলো বোঝাই মুশকিল।

অবাক হয়ে পুরো ঘরে চোখ বোলাল কিশোর। একা রয়েছে সে। দরজা বন্ধ।

ফিসফিস করে বলেই চলেছে রা-অরকন। কান পেতে আছে কিশোর। কেমন এক ধরনের আদেশের সুর রয়েছে বলার ভঙ্গিতে। কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারছে না সে।

কোটের নিচে কোমরের বেল্টের সঙ্গে আটকানো রয়েছে একটা পোর্টেবল টেপ রেকর্ডার। খুলে নিয়ে ওটা মমির ঠোঁটের কাছাকাছি রাখল কিশোর। রেকর্ডিং

সুইচ টিপে দিয়েছে।

'রা-অরকন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না,' জোরে বলল কিশোর। 'আরেকটু জোরে বলুন।'

ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল কথা, আবার শুরু হল। অনর্গল উচ্চারিত হচ্ছে কিছু দুর্বোধ্য শব্দ, নানারকম আওয়াজের মাঝে বোঝা-ই কঠিন। টেপ-রেকর্ডারের মাইক্রোফোন কথা ধরতে পারবে তো?—সন্দেহ হচ্ছে কিশোরের।

মিনিটখানেক ধরে একটানা কথা বলে যাচ্ছে রা-অরকন। ভাল করে শোনার জন্যে কান মমির ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল কিশোর। ক্ষণিকের জন্যে থামল কথা। সোজা হতে গেল সে। পুরানো কফিনের বেরিয়ে থাকা সূচালো একটা কাঠের ফলায় আটকে গেল দাড়ি। হ্যাঁচকা টানে খুলে গেল গাল থেকে। বেকায়দা ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাবা দিয়ে ধরতে গেল দাড়ি। ভারসাম্য হারিয়ে দড়াম করে পড়ল মেঝেতে। নাকের ওপর থেকে খসে পড়ে গেল চশমা, উইগ খুলে চলে এল চোখের ওপর। নিজের অজান্তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

অন্ধের মত উঠে দাঁড়াল কিশোর। চুল দাড়ি আবার জায়গামত লাগানর চেষ্টা চালাচ্ছে দ্রুত হাতে।

এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল রবিন আর প্রফেসর।

'কিশোর, কি হয়েছে?' রবিন উদ্বিগ্ন।

'তোমার চিৎকার শুনলাম!' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'কিছু হয়েছে?'

'আমার অসাবধানতা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'বোধহয় সব ভজঘট করে দিয়েছি! মমি কথা বলছিল...'

'বোকা বানিয়েছ তাহলে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'জানি না কি করেছি! কথা তো বলেছিল! দেখি, আবার বলে কিনা!' আবার মমির ওপর ঝুঁকল কিশোর। 'রা-অরকন, বলুন। রা-অরকন?' অপেক্ষা করছে তিনজনে। মমি নীরব। নিজেদের শ্বাস ফেলার শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও নিস্তব্ধ ঘরে।

'লাভ নেই,' অবশেষে বলল কিশোর। 'আর এখন কথা বলবে না মমি। দেখি, টেপে রেকর্ড হয়েছে কিনা।'

যন্ত্রটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল গোয়েন্দাপ্রধান। পেছনে এগোল রবিন আর প্রফেসর। পাশের ঘরে চলে এল।

টেপ রেকর্ডারটা টেবিলে রাখল কিশোর। গা থেকে কোট খুলে ফেলল। খুলল পেটে বাঁধা কাপড়। তারপর টেপ রিউইণ্ড করে নিয়ে প্লে লেখা বোতাম টিপে দিল।

কয়েক মুহূর্ত শুধু স্পীকারের মৃদু হিসহিস শব্দ। তারপরেই শোনা গেল কথা। খুবই মৃদু। বোঝাই যায় না প্রায়। ভলিউম বাড়িয়ে দিলে স্পীকারের শব্দও বেড়ে

যায়। আরও বোঝা যায় না কথা।

শেষ হল মমির কথা। কিশোরের চিৎকারটা শোনা যেতেই সুইচ অফ করে দিল সে। প্রফেসরের দিকে তাকাল। 'কিছু বুঝতে পেরেছেন, স্যার?'

নীরবে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। তারপর বললেন, 'একআধটা শব্দ পরিচিত মনে হচ্ছে, তবে মানে বুঝতে পারছি না। মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা, সন্দেহ নেই, খুবই প্রাচীন। সারা ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন লোকই আছে, যে হয়ত এর মানে উদ্ধার করতে পারবে। সে প্রফেসর জিম উইলসন, আমার সহকারীর ছেলে।' হাত তুলে জানালা দিয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়িটা দেখালেন। 'দেখা যাচ্ছে, কাছে। আসলেও তাই। তবে সরাসরি যাওয়ার পথ নেই, পাহাড় ঘুরে যেতে হয়। ট্যাক্সিতে করে গেলে পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না। ওকে আগেই বলেছি মমিটার কথা। আমাকে সাহায্য করবে বলে কথাও দিয়েছে। চল, টেপটা নিয়ে এখুনি তার কাছে চলে যাই।'

কিশোর রাজি।

হুপারকে ডাকলেন প্রফেসর। সে এলে বললেন, 'হুপার, আমরা জিমের বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি থাক। কড়া নজর রাখবে চারদিকে। তেমন সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তৈরি হয়ে প্রফেসর উইলসনের বাড়ির দিকে রওনা হল তিনজনে। বিশাল বাড়িটায় একা হুপার। রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সে। কয়েকটা প্লেট মাজছিল, শেষ হয়নি মাজা। আবার কাজে মন দিল।

বাইরে অন্ধকার নামছে। প্লেট মাজতে মাজতেই অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনতে পেল হুপার। থমকে গেল। কান পাতল।

কিন্তু আর শোনা গেল না শব্দটা। সন্দেহ গেল না হুপারের। হাতের বাসনটা নামিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রফেসরের সংগ্রহ থেকে প্রাচীন এক বিশাল তলোয়ার তুলে নিয়ে পা টিপে এগোল জাদুঘরের দিকে।

যেখানে যেটা যেভাবে রাখা ছিল, তেমনি রয়েছে। কোন রকম নড়চড় হয়নি। তেমনি পড়ে আছে কফিনটা, ডালা বন্ধ। জানালা বন্ধ করে গিয়েছিল, বন্ধই আছে।

এগিয়ে গিয়ে একটা জানালা খুলল। ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে নামল চত্বরে। ঠিক তখনই আবার কানে এল শব্দটা। অদ্ভুত খসখসে ভাষায় কি একটা আদেশ দিল যেন কেউ! কে কাকে আদেশ দিল! তাকেই নয় তো! প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে হুপার। দুরুদুরু করছে বুকের ভেতর। পাগলের মত চারদিকে তাকাচ্ছে।

এক পাশে একটা ঝোপের ভেতর নড়াচড়া লক্ষ্য করল। তলোয়ারটা তুলে ধরল আত্মরক্ষার তাগিদে। আবছা অন্ধকারে দেখল, বেরিয়ে আসছে একটা মূর্তি।

দেহটা মানুষের, তবে গলার ওপরের অংশ পুরোপুরি শেয়াল। দুই চোখ জ্বলছে।

'আনুবিস!' ফিসফিস করে নিজেকেই যেন বলল হুপার। 'শেয়ালদেবতা!'

এক পা সামনে বাড়ল আনুবিস। ধীরে ধীরে তুলল ডান হাত। টান টান সোজা করল সামনের দিকে। তর্জনী নির্দেশ করছে হুপারকে।

ঠিক বুঝতে পারল না হুপার, কি ঘটল। অস্বাভাবিক দুর্বল বোধ করছে। চোখের পলকে যেন অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেছে তার শরীরের যন্ত্রপাতিগুলোতে। হাত থেকে খসে পড়ল তলোয়ার। সেই সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল সে-ও।

আট

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি। ছোট একটা ব্রিজ-গ্যারেজের সঙ্গে রাস্তার যোগাযোগ রেখেছে। নিচে ঢালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রফেসর উইলসনের বাংলো।

'সরু রাস্তা,' বলল ড্রাইভার। 'সামনের দিক থেকে কোন গাড়ি এলে মোড় ঘোরার আগে দেখতে পাবে না। লাগিয়ে বসতে পারে আমার ট্যাক্সিতে। আপনারা যান। পাহাড়ের নিচে একটা পার্কিং লট আছে। ওখানে অপেক্ষা করব আমি।'

গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর। ব্রিজ পেরিয়ে দেখল, গ্যারেজের এক পাশ থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে সদর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। বেল বাজালেন প্রফেসর।

দরজা খুলে দিল উইলসন। 'আরে, প্রফেসর! আসুন, আসুন। মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন ভাষা নিয়ে ডিকশনারি লিখছি, ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। তো, এই অসময়ে কি মনে করে?'

জানালেন প্রফেসর বেনজামিন।

খুব উত্তেজিত মনে হল উইলসনকে। 'অবিশ্বাস্য! এখনই শুনব ক্যাসেটটা! বুড়ো মিয়া কি বলছে বোঝা দরকার।'

পথ দেখিয়ে মেহমানদেরকে স্টাডিতে নিয়ে এলেন উইলসন। বইয়ে প্রায় বোঝাই হয়ে গেছে ঘরটা। আর আছে কয়েকটা রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার। ক্যাসেটটা নিয়ে একটা মেশিনে ঢুকিয়ে চালু করে দিলেন তিনি।

রা-অরকনের ফিসফিসে গলার আওয়াজ অনেক গুণ পরিবর্ধিত করে সারা ঘরে ছড়িয়ে দিল যেন স্পীকার। শুনতে শুনতে হতাশা ফুটল উইলসনের চেহারায়। উত্তেজনা চলে গেছে। 'দুঃখিত, প্রফেসর, একটা শব্দও বোঝা যাচ্ছে না। রেকর্ডিং খুব খারাপ, আসল শব্দের চেয়ে মেশিনের শব্দই বেশি ক্যাচ করেছে। আরেকটা মেশিন আছে আমার। ফালতু আওয়াজ কমিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা আছে ওটাতে। দেখি ওটাতে লাগিয়ে। কাজ হতেও পারে।'

বেরিয়ে গেলেন উইলসন। ফিরে এলেন ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার সেট

নিয়ে। ক্যাসেটটা আগের মেশিন থেকে বের করে নিয়ে নতুনটাতে ভরলেন। টিপে দিলেন প্লে লেখা বোতাম।

কাজ সারতে খুব একটা দেরি হল না মুসার। প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিল। সেকথা বলল বোরিসকে।

প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে যখন পৌঁছল ট্রাক, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। একটা মাত্র আলো দেখা যাচ্ছে এত বড় বাড়িটাতে।

'মনে হচ্ছে বাড়িতে কেউ নেই,' বলল বোরিস। 'যাবে?'

'কেউ না থাকলেও প্রফেসরের খানসামা থাকবেই,' বলল মুসা। নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। 'ওর কাছেই জানতে পারব কে কোথায় গেছে, যদি গিয়ে থাকে।'

হাতঘড়ি দেখল বোরিস। 'তাড়াতাড়ি এস। রোভারকে নিয়ে সিনেমায় যাব। ও অপেক্ষা করবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসতে পারবে?'

'আপনি চলে যান তাহলে,' বলল মুসা। 'কত দেরি হবে ঠিক বলতে পারছি না। পাহাড়ের নিচে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড দেখলাম। বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না।'

'ঠিক আছে,' ইঞ্জিন স্টার্ট দিল বোরিস। চলে গেল ট্রাক নিয়ে।

বাড়ির সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। বেল বাজাল। অপেক্ষা করছে দরজা খোলার। মিসেস ভেরা চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা ভাবছে।

দ্রুত কথা বললেন মহিলা। অনেক কথাই বলে ফেলেছেন খুব কম সময়ে। হপ্তাখানেক আগে হারিয়ে গেছে তাঁর শখের বেড়ালটা। খুব সুন্দর দেখতে। এ-অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য। বেশির ভাগ আবিসিনিয়ান বেড়ালই বুনো স্বভাবের, পোষ মানে, তবে মনিবের সঙ্গেও ব্যবহার খারাপ করে। কিন্তু ওই বিশেষ বেড়ালটা ছিল ঠিক উল্টো। ভদ্র, কোনরকম বাজে স্বভাব ছিল না। মিসেস চ্যানেলের ধারণা, হয় বেড়ালটাকে চুরি করা হয়েছে, কিংবা বাড়ি থেকে দূরে কোথাও চলে গিয়েছিল, পথ চিনে আর ফিরতে পারেনি।

বেড়ালটা পিঙ্গল রঙের, শুধু সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ সাদা। চোখ দুটোতে আশ্চর্য একটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। আবিসিনিয়ায় বেড়ালের চোখ সাধারণত হলুদ কিংবা কমলা রঙের হয়। অথচ স্ফিঙ্কসের একটা চোখ কমলা, আরেকটা নীল। এই বিশেষ ব্যাপারটার জন্যে কয়েকবারই বেড়ালের মেলায় ওটাকে নিয়ে গেছেন মিসেস চ্যানেল। দেখিয়ে লোককে অবাক করে দেয়ার জন্যে। স্থানীয় অনেক পত্র-পত্রিকা আর ম্যাগাজিনে বেরিয়েছেও খবরটা স্ফিঙ্কসের রঙিন ফটোগ্রাফসহ। জীববিজ্ঞানীদের মতে বেড়ালের চোখের রঙের সেই বৈসাদৃশ্য খুব বিরল একটা ব্যাপার।

কিন্তু এখনও দরজা খুলছে না কেন হুপার? অবাক হল মুসা। আবার বাজাল বেল। সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকল সে হুপারের নাম ধরে। তবু জবাব নেই।

চারদিকে তাকাল মুসা। অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। গলা আরও চড়িয়ে ডাকল হুপারকে। সাড়া না পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলল জাদুঘরের দিকে। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে ওঘরেই। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। কফিনটা জায়গামতই রয়েছে। জানালার কাছে তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেবতা আনুবিসে মূর্তি। কোন রকম গোলমাল চোখে পড়ল না তার। কিন্তু তবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। মনে হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কি সেটা? মেরুদণ্ডে অদ্ভুত এক ধরনের শিরশিরে অনুভূতি হচ্ছে এখন।

কফিনের ঢাকনা তুলে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু ভরসা পাচ্ছে না। যদি একা পেয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে মমিটা? থাক বাবা, খুলে কাজ নেই। ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল মুসা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সেই জানালাটার কাছে, যেটা দিয়ে দেখা যায় প্রফেসর উইলসনের বাড়ি। উঁকি দিল বাইরে। অন্ধকার বাগান। ঘরের আলো পড়েছে খানিকটা জায়গায়, তাতে আশপাশটা আরও বেশি অন্ধকার দেখাচ্ছে। কালো আকাশে অগুণতি তারা। এক বিন্দু বাতাস নেই, গাছের একটা পাতাও নড়ছে না। কালো ঝোপগুলোর দিকে চেয়ে মেরুদণ্ডের শিরশিরে অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। হঠাৎই ভয় পেতে শুরু করেছে সে। গেল কোথায় সব? কোন অঘটন ঘটল না তো? ঘুরে দাঁড়ানর আগের মুহূর্তে চোখে পড়ল জিনিসটা। জানালা দিয়ে আলো পড়েছে বাগানে। আলো আর অন্ধকারের সীমারেখার কাছে চকচক করছে কিছু একটা।

ভয় নেই, বলে মনকে বোঝানর চেষ্টা করল মুসা। সাহস সঞ্চয় করে জানালা টপকে নামল বাগানে। কাছে গিয়ে তুলে নিল চকচকে জিনিসটা। একটা তলোয়ার। অনেক পুরানো, ব্রোঞ্জের তৈরি। নিশ্চয় প্রফেসর বেনজামিনের সংগ্রহের জিনিস। ঠিক এই সময় মৃদু একটা শব্দ হল পেছনে। ধক করে উঠল মুসার বুকের ভেতর। পাঁই করে ঘুরল।

ঝোপের ভেতর নড়ছে কিছু একটা। পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এল ছোট একটা চারপেয়ে জীব। ধীরে ধীরে কাছ চলে এল। বেড়াল। মুখ তুলে তাকাল মুসার দিকে। পরক্ষণেই তার পায়ে গা ঘষতে শুরু করল। মৃদু ঘড়ঘড় শব্দ করছে। আদর চাইছে বোধহয়।

হেসে ফেলল মুসা। দূর হয়ে গেছে উত্তেজনা, শঙ্কা, ভয়। তলোয়ারটা মাটিতে রেখে বেড়ালটাকে তুলে নিল দু'হাতে। সুন্দর একটা বেড়াল। হুলো। বেশ বড়। পিঙ্গল রঙ। মৃদু ঘড়ঘড় করেই চলেছে। দু'পা এগিয়ে আলোতে এসে দাঁড়াল মুসা। এই সময় মুখ তুলে তাকাল বেড়ালটা তার দিকে। হাত থেকেই প্রায় ছেড়েই দিচ্ছিল ওটাকে মুসা। নিজের অজান্তেই চাপা একটা শব্দ করে উঠল, 'ইয়াল্লা!' এটা স্ফিঙ্কস। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল! —ভাবছে মুসা। এটা এখানে এল কি করে? যেভাবেই আসুক, কপালগুণেই খুঁজে পেয়েছে সে এটাকে। কিশোরের দিকে

চেয়ে খুব একখান হাসি দিতে পারবে এবারে। এত তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে গেছে কেস।

জানালার দিকে পা বাড়াল মুসা, ঠিক এই সময় ভারি একটা কিছু এসে পড়ল তার ওপর, পেছন থেকে। চেঁচিয়ে উঠে হাত থেকে বেড়ালটাকে ছেড়ে দিল সে। তাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ঘাসের ওপর। পিঠের ওপর চেপে এল একটা ভারি কিছু।

এক মুহূর্ত। তারপরই হুঁশ ফিরে পেল মুসা। এক গড়ান দিয়েই সরে গেল, পিঠের ওপর থেকে ফেলে দিল বোঝাটা। পাশ ফিরে তাকাল। সেই ছেলেটা। সকালে ঝোপের ভেতর বসে ছিল যে, যাকে ধরে ফেলেছিল। ছেলেটা উঠে দাঁড়ানর আগেই বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন মুসার শরীরে। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে চিতার মত লাফিয়ে পড়ল ছেলেটার ওপর। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল কোমর। এবার আর ছাড়বে না কিছুতেই।

অনেক চেষ্টা করল ছেলেটা, কিন্তু ছাড়া পেল না মুসার হাত থেকে।

'মুসা আমানের হাতে পড়েছ, খোকাবাবু,' বলল গোয়েন্দাসহকারী, 'সহজে ছাড়া পাচ্ছ না আর। কে তুমি? এদিকে এত ঘোরাফেরা কিসের? আমাকে আক্রমণ করছ কেন?'

আবার ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করল ছেলেটা। তারপর হাল ছেড়ে দিল। চেঁচিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'তোমরা আমার দাদা রা-অরকনকে চুরি করেছ! আমার বেড়ালটাকে ধরে রাখতে চাইছ! কিন্তু আমি জামান বংশের ছেলে জামান, সেটা কিছুতেই হতে দেব না!'

'দাদা রা-অরকন! চুরি করেছি!' মুসা অবাক। 'আর ওটা তোমার বেড়াল? ভুল করছ, খোকাবাবু। বেড়ালটা তোমার নয়। ওটার মালিক মিসেস ভেরা চ্যানেল। আর আমি ওটাকে ধরে রাখতে চাইনি। ওটাই আমার কাছে এসেছে। খাতির করতে চেয়েছে।' ঠেলতে ঠেলতে ছেলেটাকে জানালার কাছে নিয়ে এল মুসা। কোমর ছেড়ে দিয়ে কব্জি চেপে ধরল।

মুসার দিকে চেয়ে আছে ছেলেটা। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে না আর। তামাটে চামড়ার রঙ, কুচকুচে কালো বড় বড় দুটো চোখ। ভ্রূকুটি করল। 'তুমি দাদা রা-অরকনের ব্যাপারে কিছু জান না! ওকে চুরি করনি?'

'কি বলছ তাই বুঝতে পারছি না,' বলল মুসা। 'মমিটার কথা বলছ? তাহলে ওটাকে দাদা-দাদা করছ কেন? ওটা তিন হাজার বছরের পুরানো। তোমার দাদা হয় কি করে? কফিনের ভেতরে রয়েছে এখন। চুরি করিনি। আর করতে যাবই বা কেন?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'কফিনের ভেতর নেই এখন ওটা।'

'নেই!'

'না, নেই। খানিক আগে দুটো লোক এসে নিয়ে গেছে। এতে তোমার কোন হাত নেই বলতে চাইছ?'

'রা-অরকনকে নিয়ে গেছে!' ছেলেটার প্রশ্ন যেন শুনতে পায়নি মুসা। 'বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'আমি সত্যি বলছি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল ছেলেটা। 'জামান বংশের জামান কখনও মিছে কথা বলে না।'

ছেলেটাকে ধরে রেখেই জানালা দিয়ে কফিনটার দিকে তাকাল মুসা। ঠিক আগের জায়গাতে আগের মতই রয়েছে। বিন্দুমাত্র সরেনি কোনদিকে। কিন্তু ছেলেটা বলছে, সে সত্যি কথা বলছে। তাহলে?

'শোন, খোকাবাবু,' বলল মুসা। 'শুনেছি, মমিটা প্রফেসর বেনজামিনের সঙ্গে কথা বলে। ওই রহস্যের সমাধান করতেই এসেছি আমরা। কেন, কি কথা বলে, কি করে বলে, বলতে পারবে কিছু?'

বিস্ময় ফুটল ছেলেটার চোখে। 'দাদা রা-অরকন কথা বলে! আশ্চর্য! না, আমি কিছু বলতে পারব না!'

'আমরাও কিছু বুঝতে পারিনি এখনও,' বলল মুসা। 'মমিটার ব্যাপারে অনেক কিছু জান মনে হচ্ছে। আমি কিছু কিছু জানি, হয়ত সেটা তুমি জান না। এ-বাড়ির ওপর চোখ রেখেছ কেন? সকালে ঝোপের ভেতর কেন লুকিয়েছিলে? কোন অসুবিধে না থাকলে বলে ফেল। হয়ত মমি রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারব আমরা। মানে, কি করে কথা বলে, কি বলে, জানতে পারব। কি, বলবে?'

দ্বিধা করছে ছেলেটা। তারপর মাথা নাড়ল। 'বেশ, বলব সব। জামান বংশের জামান বিশ্বাস করল তোমাকে। হাত ছাড়, ব্যথা পাচ্ছি।'

হাত ছেড়ে দিল মুসা।

কব্জির কাছটায় ডলতে লাগল ছেলেটা। ঝোপের দিকে চেয়ে তার নিজের ভাষায় কিছু বলল চেঁচিয়ে।

'কি বলছ?' জানতে চাইল মুসা।

'আমার বেড়ালটাকে ডাকছি। ওর ভেতরে বাস করে রা-অরকনের আত্মা। মমিটা খুঁজে পেতে সাহায্য করবে ওটা আমাদের।'

অপেক্ষা করে রইল দু'জনে। কিন্তু এল না বেড়ালটা।

'বলেছিল না?' অবশেষে বলল মুসা। 'ওটা তোমার বেড়াল নয়। মিসেস চ্যানেলের। নাম, স্ফিঙ্কস। আবিসিনিয়ার বেড়াল, পিঙ্গল শরীর। সামনের দুই পা সাদা। দুই চোখ দুই রঙের। মহিলার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।'

'না,' গভীর আস্থা ছেলেটার কণ্ঠে। 'পা সাদা নয়, কালো। রা-অরকনের প্রিয় বেড়াল। যেটাকে মেরে মমি করে কফিনে তার সঙ্গে দিয়ে দেয়া হয়েছিল হাজার হাজার বছর আগে।'

দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গড়ল মুসা। বড় বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে জামান বংশের জামান। বেড়ালটার পায়ের রং সাদাই দেখেছে কিনা, মনে করতে পারছে না। ভাবনায় পড়ে গেল। 'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে ভাবব। এস দেখি, তোমার কথা ঠিক কিনা। সত্যিই চুরি গেছে কিনা মমিটা।'

জানালা গলে দু'জনে ঢুকল জাদুঘরে। ধরাধরি করে তুলে ফেলল কফিনের ঢাকনা। ঠিকই বলেছে জামান বংশের জামান। শূন্য কফিন।

'ইয়াল্লা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'কে নিল!'

'তোমাদেরই কেউ নিয়েছে! চুরি করেছে আমার দাদাকে!' ঝাঁঝালো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা।

'না, জামান,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'এই চুরির ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না আমি। "তোমাদের" বলতে যাকে বোঝাতে চাইছ? এ বাড়িতে আমরা তিন বন্ধু এসেছি। অন্য দু'জন আমার বয়েসী। মমিটা কথা বলে কেন, সে রহস্য ভেদ করতে এসেছি। সে যাই হোক, মমিটা সম্পর্কে তুমি যা জান বল, আমি যা জানি বলব। হয়ত একটা সমাধান বেরিয়েও যেতে পারে। কে চুরি করল মমিটা, তা-ও জেনে যেতে পারি হয়ত।'

কি যেন ভাবল জামান। মাথা কাত করল, 'বেশ, কি জানতে চাও?'

'আমার প্রথম প্রশ্ন, রা-অরকনকে দাদা বলছ কেন?'

'জামান বংশের অনেক প্রাচীন পূর্বপুরুষ রা-অরকন,' গর্বিত কণ্ঠ জামানের। 'তিন হাজার বছর আগে লিবিয়ানরা গিয়ে মিশর শাসন করেছিল। রা-অরকন লিবিয়ান। তিনি ছিলেন এক মহান রাজা। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেন না বলে, অত্যাচারীকে কঠোর হাতে দমন করতেন বলে, খুন করা হয় তাঁকে। তাঁর লাশ নষ্ট করে ফেলতে পারে শত্রুরা—জান হয়ত, মমি নষ্ট করে ফেললে সেই লোকের আত্মা আর পরপারে গিয়ে ঠাঁই পায় না, প্রাচীন মিশরীয়দের বিশ্বাস ছিল, তাই গোপনে গোপন জায়গায় কবর দেয়া হল তাঁকে। বিনা আড়ম্বরে। তাঁর বংশের এক ছেলে আবার লিবিয়ায় ফিরে গিয়েছিল। সেই ছেলেরই বংশধর আমরা।'

'জানলে কি করে এত সব? কোন প্রাচীন ডায়েরী-টায়েরী ... মানে ফলকে লেখা...'

মাথা নাড়ল জামান। 'না, ওরকম কিছু না। এক জ্যোতিষের কাছে জেনেছেন এটা বাবা। মহা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। অতীত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। সে-ই জানিয়েছে, রা-অরকনকে অনেক দূরের এক দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মিশর থেকে, বর্বরদের দেশে। ওখানে মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না রা-অরকন, তাঁর ঘুমের খুব ব্যাঘাত ঘটছে। আমার বাবা অসুস্থ, তাই মমিটা নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন জলিলকে। সে আমাদের ম্যানেজার। সঙ্গে দিয়েছেন আমাকে। বংশের কেউ নিতে না এলে যদি কিছু মনে করে রা-অরকন, সেজন্যে।'

অন্য সময় হলে 'বর্বর' শব্দটার প্রতিবাদ করত মুসা। কিন্তু এখন অন্য ভাবনা চলেছে মাথায়। সকালে প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন, একজন অ্যারাবিয়ান ব্যবসায়ী মমিটা নিতে এসেছিল। তার নাম জলিল। লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। 'ও, এই জন্যেই এ বাড়ির আশেপাশে এত ঘোরাফেরা তোমার?' বলল মুসা। 'তুমি আর জলিল মিলে রা-অরকনকে চুরি করার ফন্দি এঁটেছিলে নাকি?'

'বর্বর প্রফেসর আমার দাদাকে দিল না,' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল জামান, 'আর কি করব? কিন্তু চুরি বলছ কেন এটাকে? আমাদের জিনিস জোর করে দখল করেছে সে। আর কোন উপায় নেই আমাদের, তাই ওকে না জানিয়েই নিয়ে যেতে চেয়েছি। দাদার আত্মার শান্তির জন্যে জান দিয়ে দিতেও আপত্তি নেই আমার। বংশের কারও অপমান সহ্য করে না জামান বংশের লোকেরা।'

'তোমাদের ম্যানেজার জলিল এখন কোথায়?'

'আছে। তাকে দেখেছ তুমি। সকালে।'

'দেখেছি!'

'হ্যাঁ, ওই মালী। যে আমাকে ধরেছিল। ইচ্ছে করেই ওর হাত কামড়ে দেয়ার সুযোগ দিয়েছিল সে আমাকে। আরবীতে চেঁচিয়ে উঠেছিল, মনে আছে? কামড়ে দিতে বলেছিল। খুব চালাক লোক। তোমাদের সবাইকে কেমন বোকা বানিয়ে ছাড়ল।'

হাঁ করে চেয়ে রইল মুসা। চমকটা হজমের চেষ্টা করছে। সেই মালীটা তাহলে জলিল! চুরি করতে এসেছে রা-অরকনকে জামানের বাবার আদেশে! তার ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই পাঁই করে ঘুরল জামান জানালার দিকে। কান পেতে শুনছে কি যেন!

'কেউ এসেছে!' চাপা গলায় বলল জামান। 'ইঞ্জিনের শব্দ!'

জানালার কাছে ছুটে গেল সে। উঁকি দিল বাইরে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল মুসা। সে-ও তাকাল।

পুরানো একটা নীল রঙের ট্রাক ঢুকছে গেট দিয়ে। চত্বরে এসে থামল। দু'জন লোক নামল। দু'জনেই মোটাসোটা, বেঁটে। সোজা এগিয়ে আসছে জাদুঘরের দিকে।

'ওই দু'জনই!' ফিসফিস করে বলল জামান। 'ওরাই চুরি করেছে রা-অরকনকে! কয়েক মিনিট আগে এসেছিল আরেকবার। কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কি তুলল ট্রাকে, এখন বুঝতে পারছি, মমিটাকেই নিয়েছে। ওরা চলে গেল। বাড়িটা খালি মনে হল। ঢুকে পড়লাম জাদুঘরে। ঢাকনা তুলে দেখি কফিনে নেই রা-অরকন।'

'এদিকেই আসছে ব্যাটারা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'চেহারা-সুরত বিশেষ সুবিধার ঠেকছে না। আবার কি চায়?'

'লুকাতে হবে! জলদি! নিশ্চয় আরও কিছু চুরি করতে এসেছে!'

'কোথায় লুকাব?' সারা ঘরে চোখ বোলাল মুসা। 'কোন জায়গা তো দেখছি না! চল, বাইরে গিয়ে ঝোপের ভেতরে...'

'তাহলে কি চুরি করতে এসেছে দেখব না। ওদের কথাবার্তাও শুনতে পাব না। এখানেই কোথাও লুকাতে হবে,' কফিনটার দিকে চেয়ে আছে জামান। 'জলদি! ওটার ভেতর লুকাব। রা-অরকন নেই, আমাদের জায়গা হয়ে যাবে। জলদি এস।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ,' সায় দিল মুসা।

ছুটে গিয়ে কফিনে ঢুকে পড়ল জামান। চাপা গলায় ডাকল, 'আহ, তাড়াতাড়ি এস!'

কফিনে ঢুকল মুসা। দু'জনে ধরে ঢাকনাটা নামিয়ে দিল জায়গামত। পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করে ডালার ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে মুসা। সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, বাতাস চলাচল করতে পারবে। ভেতরে থেকে শ্বাস নিতে অসুবিধা হবে না।

পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে দু'জনে কফিনের ভেতর। ঠিক এই সময় দরজা খোলার শব্দ হল। মেঝেতে ভারি পায়ের শব্দ।

'দড়িটা খোল, ওয়েব,' শোনা গেল একটা কণ্ঠ।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। 'খুলেছি,' শোনা গেল আরেকটা কণ্ঠ। 'মেথু, লোকটাকে মোটেই পছন্দ হয়নি আমার। আগে বলল না কেন ব্যাটা, কফিনটা সহ চায়? একবারেই কাজ সারতে পারতাম। আবার এখানে পাঠাল যখন দেব ফিস ডবল করে।'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল মেথু। 'ডাবল চাইব। নইলে...ঠিক আছে, এস বেঁধে ফেলি।'

মুহূর্ত পরেই টের পেল মুসা আর জামান, নড়ছে কফিন। একটা প্রান্ত উঠে যাচ্ছে ওপরে। দড়ি ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে নিশ্চয়। বুঝতে পারছে ওরা, কফিনের সঙ্গে ডালাটা শক্ত করে পেঁচিয়ে বাঁধা হচ্ছে। ভাগ্যিস পেন্সিলটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল! নইলে দম বন্ধ হয়েই মরতে হত!

'কফিনটাও চুরি করবে ব্যাটারা।' মুসার কানে ফিসফিস করল জামান। গাঢ় অন্ধকার ভেতরে। 'এখন কি করব আমরা?'

'চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে,' ফিসফিস করে জবাব দিল মুসা। 'এছাড়া আর কিছু করার নেই। কে বা কারা ওদেরকে পাঠিয়েছে, জানার সুযোগ পেয়েছি। কোথায় নিয়ে যায় ওরা কফিনটা জানতে পারব। নিয়ে যাক আগে। তারপর সুযোগ বুঝে বেরোনর চেষ্টা করব। হয়ত জায়গায় পৌঁছে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলবে। কি, ভয় পাচ্ছ?'

'জামান বংশের জামান ভয় পায় না!'

'আমিও না,' বলল মুসা। 'তবে অস্বস্তি বোধ করছি।'

দু'দিক থেকে তোলা হল কফিনটা, টের পেল ওরা।

'আরিব্বাপরে! কি সাংঘাতিক ভারি!' শোনা গেল ওয়েবের কণ্ঠ।

'সীসা দিয়ে বানিয়েছে নাকি!...ধর, শক্ত করে ধর! ফেলে দিয়ে ভেঙ না। তাহলে একটা কানাকড়িও আদায় করতে পারব না।'

কফিনটা বয়ে নেয়া হচ্ছে, বুঝতে পারল মুসা আর জামান। ট্রাকের পেছনে তোলা হল, শব্দ শুনেই অনুমান করল।

'ব্যাটা এসব জিনিস দিয়ে কি করবে?' বলল ওয়েব।

'কি করবে কে জানে! কতরকম পাগল আছে দুনিয়ায়! মরা লাশও কাজে লাগে ওদের! হুঁহ্! জাহান্নামে যাক ব্যাটারা। আমাদের টাকা পেলেই হল। এস, ওঠ। স্টার্ট দাও।'

দড়াম করে বন্ধ হল কেবিনের দরজা। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। চলতে শুরু করল ট্রাক।

অবাক হয়ে ভাবছে মুসা আর জামান, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কফিনটা!

নয়

বিশতম বার ক্যাসেটটা শোনা শেষ করলেন প্রফেসর উইলসন। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন প্রফেসর বেনজামিন, রবিন আর কিশোর।

'কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি,' অবশেষে বললেন উইলসন। 'কয়েকটা শব্দ বোঝা যাচ্ছে।' ক্যাসেট প্লেয়ারের সুইচ অফ করে দিলেন। সিগারেটের বাক্স বের করে বাড়িয়ে ধরলেন প্রফেসর বেনজামিনের দিকে। 'রেকর্ড করলেন কি করে?'

একেবারে গোড়া থেকে শুরু করলেন প্রফেসর। তাঁর ওপর কি করে আনুবিস পড়তে যাচ্ছিল, একেবারে সেখান থেকে। মাঝপথে বাধা পড়ল। বাড়ির কোথাও একটা দরজার ঘন্টা বাজল।

'গ্যারেজের কাছে এসেছে কেউ,' বললেন উইলসন। 'আসছি। আপনারা বসুন।'

উইলসন বেরিয়ে যেতেই ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'বলেছিলাম না, কেউ যদি ওই ভাষা বোঝে তো জিমই বুঝবে। বাপের কাছে শিক্ষা পেয়েছে তো। তার বাপও প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় বিশেষজ্ঞ ছিল।'

'মমিটা তুলে আনার এক হপ্তা পর যিনি কায়রোর বাজারে খুন হয়েছিলেন?' বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' হাত তুললেন প্রফেসর। 'না না, আবার ওই অভিশাপের কথা তুল না।

ওটা নিছকই দুর্ঘটনা। দুস্যুতস্করের অভাব নেই ওখানে। হয়ত টাকা পয়সা পাওয়ার লোভেই খুন করেছে বেচারাকে।'

ফিরে এলেন উইলসন। হাতে ট্রে, চারটে গ্লাসে কমলার রস, আসতে দেরি হয়েছে বোধহয় এজন্যেই। 'সমাজসেবা, হুঁহ্! চাঁদার জন্যে এসেছিল কয়েকজন। কি আনন্দ পায় ওসব করে!...যাকগে, নিন,' ট্রে-টা বাড়িয়ে ধরল প্রফেসরের দিকে।

একটা করে গ্লাস তুলে নিল সবাই।

গ্লাস হাতেই গিয়ে শেলফ থেকে মোটা একটা বই বের করে আনলেন উইলসন। 'বিরল একটা ডিকশনারি। বাবা জোগাড় করেছিল কোত্থেকে জানি! এখন কাজে লাগবে।' বইটা টবিলে রেখে আবার ক্যাসেট প্লেয়ার চালু করে দিলেন তিনি। তিন ঢোকে কমলার রস শেষ করে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। মনোযোগ দিয়ে ক্যাসেট শুনছেন, আর কি সব লিখে নিচ্ছেন কাগজে। মাঝে মঝে ডিকশনারি খুলে মিলিয়ে নিচ্ছেন।

শেষ হল ক্যাসেট। কলম রেখে উঠে দাঁড়ালেন উইলসন। জানালার কাছে গিয়ে বাইরের তাজা বাতাস টানলেন। ফিরে দাঁড়ালেন তারপর। 'প্রফেসর, অনেক প্রাচীন আরবী শব্দ রেকর্ড করেছেন। আধুনিক আরবী উচ্চারণের সঙ্গে অনেক তফাৎ। মানে উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু...কিন্তু...'

'বলে যাও,' ভরসা দিলেন প্রফেসর। 'আমি শুনব।'

'প্রফেসর...ইয়ে, মানে,' দ্বিধা যাচ্ছে না উইলসনের। 'অর্থ যা বুঝলাম, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না! একটা মেসেজ। বলেছেঃ দেশ থেকে অনেক দূরে রয়েছে রা-অরকন। ওর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। যারা তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে, তাদের ওপর অভিশাপ নামুক। যতক্ষণ রা-অরকনের শান্তি না আসছে, তাদের অশান্তি হতেই থাকুক। এরপরও সতর্ক না হলে ভয়ঙ্কর মৃত্যু টেনে নিক তাদের।'

মেরুদণ্ড বেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিহরণ খেলে গেল রবিনের। এমনকি কিশোরের চেহারা থেকেও রক্ত সরে গেছে।

অস্বস্তি বোধ করছেন প্রফেসর বেনজামিন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। 'জিম, ওই অভিশাপের ভয় আমি করি না, বিশ্বাস করি না,' সামনের দিকে চিবুক বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'করবও না।'

'ঠিকই,' স্বীকার করলেন উইলসন, 'ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক।'

'পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক,' ঘোষণা করলেন যেন বেনজামিন।

'তবু ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই,' বলল উইলসন। 'মমিটা কি ক'দিনের জন্যে আমার এখানে নিয়ে আসবেন? দেখি, আমার সঙ্গে কথা বলে কিনা ওটা। যদি নতুন কিছু বলে...'

'যা খুশি বলুক গে, কিচ্ছু এসে যায় না আমার, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি এখনও

বিশ্বাস করি না মমিটা কথা বলেছে। নিশ্চয় কোন রহস্য রয়েছে ভেতরে,' রবিন আর কিশোরকে দেখিয়ে বললেন প্রফেসর, 'এদেরকে ডেকে এনেছি আমাকে সাহায্য করার জন্যে। রহস্যটার সমাধান আমরা করবই।'

শ্রাগ করলেন উইলসন। মমি তাঁর এখানে নিয়ে আসার জন্যে আর চাপাচাপি করলেন না।

ভাষাবিদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল গ্যারেজের পাশে। ব্রিজ পেরিয়ে এসে নামল রাস্তায়। ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে পাহাড়ী পথ। শ'খানেক গজ নিচেই পার্কিং লট, ওখানেই ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার।

গাড়িতে উঠে বসল তিনজনে। প্রফেসরের বাড়ির দিকে চলল ট্যাক্সি।

'বলেছিলাম না,' পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে বললেন প্রফেসর, কেউ যদি পারে, জিমই পারবে। কিশোর, রা-অরকনের ফিসফিসানীর ব্যাপারে আর কোন নতুন থিয়োরী এসেছে মাথায়?'

'না, স্যার,' চিন্তিত কিশোর। 'ব্যাপারটা সত্যিই বড় বেশি রহস্যময়।'

'মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত!' বিড় বিড় করল রবিন।

পৌঁছে গেল গাড়ি। নেমে পড়ল তিনজনে।

সদর দরজায় দাঁড়িয়ে বেল বাজালেন প্রফেসর।

সাড়া নেই।

আবার বাজালেন। তবু সাড়া নেই। চেঁচিয়ে ডাকলেন, 'হুপার! হুপার! কোথায় গেলে!'

নীরবতা। সাড়া দিল না হুপার।

'আশ্চর্য!' আপন মনেই বললেন প্রফেসর। 'গেল কোথায়!'

'চলুন, জাদুঘরের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ি,' পরামমর্শ দিল কিশোর। 'খুঁজে দেখলেই হবে, কোথায় কি করছে।'

জাদুঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'কফিনটা কোথায়, প্রফেসর!'

কফিনের জায়গাটা শূন্য। মেঝেতে হালকা ধুলো জমেছে, তাতে কিছু আঁচড় আর ভারি জিনিস টানাহেঁচড়ার দাগ। দলা পাকানো নীল একটা রুমাল পড়ে আছে এক জায়গায়।

'রা-অরকনকে চুরি করেছে কেউ!' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'কিন্তু কে করল? জিজ্ঞেস করল? জিনিসটার কোন দামই নেই। মানে, কমার্শিয়াল কোন দাম নেই। বিক্রি করা যাবে না।' ভ্রূকুটি করলেন হঠাৎ। 'বুঝেছি! সেই অ্যারাবিয়ান! যাকে বের করে দিয়েছিলাম। পুলিশকে ফোন করতে হচ্ছে। কিন্তু,' দ্বিধা করছেন প্রফেসর। 'কিন্তু ওদেরকে ডেকে আনলে সব খুলে বলতে হবে। মমি কথা বলেছে, এটাও জানাতে হবে। আগামী কালই বেরিয়ে যাবে খবরের কাগজে খবরটা। এবং

আমার ক্যারিয়ার শেষ। নাহ্, পুলিশ ডাকা যাচ্ছে না।' ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। চিন্তিত। অসহায় হয়ে পড়েছে যেন। 'কি করি এখন? কি করি?'

কোন পরামর্শ দিতে পারল না রবিন।

নীল রুমালটা তুলে নিয়েছে কিশোর। 'কফিনটা বয়ে নিতে অন্তত দু'জন লোক দরকার। যদি, ওই জলিলই করে থাকে কাজটা, তার সঙ্গে আরও একজন রয়েছে। এই যে রুমালটা, কালিঝুলি দেখা যাচ্ছে। শ্রমিকের চিহ্ন। তাড়াহুড়োয় ফেলে গেছে হয়ত।'

হাতের তালু দিয়ে কপাল ঘষছেন প্রফেসর। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন উদ্ভট! মমি কথা বলল, তারপর গেল গায়েব হয়ে...' থমকে গেলেন তিনি। 'আরে হ্যাঁ, হুপারের কথাই তো ভুলে গেছি! ও গেল কোথায়? বদমাশরা তাকে মেরে ফেলল না তো! চল্, চল, খুঁজে দেখি!'

'চোরগুলোর সঙ্গে হাত মেলায়নি তো?' অনেক রহস্য কাহিনী পড়েছে রবিন, যেগুলোতে বাড়ির চাকর-বাকর খানসামারাই চোর-ডাকাতের সহায়ক।

'না, না, কি বল!' জোরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'দশ বছর ধরে কাজ করছে সে আমার কাছে। চল, খুঁজে বের করতে হবে ওকে।'

বাগানে বেরিয়ে এল ওরা। চোখে পড়ল তলোয়ারটা। নিচু হয়ে তুলে নিলেন প্রফেসর। 'আমার সংগ্রহের জিনিস! নিশ্চয় এটা নিয়ে বাধা দিতে গিয়েছিল হুপার! বেচারাকে মেরেই ফেলল কি না কে জানে! আর পুলিশ না ডেকে পারা যাবে না!'

ঘুরে দাঁড়াতে গেলেন প্রফেসর, এই সময় মৃদু একটা গোঙানি কানে এল। চত্বরের শেষ প্রান্তে একটা ঝোপের ভেতর থেকে এসেছে। কিশোরও শুনেছে শব্দটা। সে-ই আগে ছুটে গেল ঝোপটার কাছে।

ঝোপের ভেতর পাওয়া গেল হুপারকে। চিত হয়ে পড়ে আছে ঘাসের ওপর। দু'হাত আড়াআড়ি রাখা হয়েছে বুকে।

ধরাধরি করে চত্বরে নিয়ে আসা হল হুপারকে, শুইয়ে দেয়া হল ঘাসের ওপর—জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে যেখানে।

'বেহুঁশ!' খানসামার ওপর ঝুঁকে বসেছে প্রফেসর। 'জ্ঞান ফিরছে নাকি! হুপার, শুনতে পাচ্ছ? হুপার?'

একবার কেঁপে উঠল হুপারের চোখের পাতা, তারপরই আবার স্থির হয়ে গেল।

'আরে, দেখুন!' ছায়ার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'একটা বেড়াল। পুষি, এস, এস!' হাত চেটে দিল। ওটাকে তুলে নিল রবিন।

'দেখ দেখ!' বেড়ালটাকে দেখছে রবিন। 'ওর চোখ দেখ! একটা নীল আরেকটা কমলা! জিন্দেগীতে এমন বিড়াল দেখিনি।'

'কি বলছ।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর। বিশ্বাস করতে পারছেন না

যেন। 'দেখি দেখি, দাও তো আমার হাতে!' বিড়বিড় করলেন, 'চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য!'

বেড়ালের চোখ দুটো দেখছেন প্রফেসর। 'আবিসিনিয়ান বেড়াল, চোখের রঙে বৈসাদৃশ্য!' আপনমনেই বিড়বিড় করছেন। 'কি যে ঘটছে, কিছুই বুঝতে পারছি না! পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত! রা-অরকনের সঙ্গে কবর দেয়া হয়েছিল তার প্রিয় বেড়ালটাকে। ওটাও ছিল আবিসিনিয়ান, দুই চোখের দুই রঙ। শরীরের রঙ পিঙ্গল, সামনের দুই পায়ের নিচের অংশ কালো। এটারও তাই!'

তাজ্জব হয়ে বেড়ালটার কুচকুচে কালো দুই পায়ের দিকে চেয়ে আছে দুই কিশোর।

'হুপারের হুঁশ ফেরানো দরকার,' বললেন প্রফেসর। 'হয়ত ও কিছু বলতে পারবে।' খানসামা একটা হাত তুলে নিয়ে তালুতে তালু ঘষতে লাগলেন জোরে জোরে। 'হুপার? হুপার? শুনতে পাচ্ছ? কথা বল!'

খানিকক্ষণ ঘষাঘষি করার পর চোখ মেলল হুপার। চোখ প্রফেসরের মুখের দিকে। কিন্তু মনিবকে দেখছে বলে মনে হয় না। কেমন যেন শূন্য দৃষ্টি!

'হুপার, কি হয়েছিল?' জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী। 'রা-অরকনকে কে চুরি করল? সেই অ্যারাবিয়ানটা?'

হুপার নীরব! কথা বলার কোন চেষ্টাই নেই।

একই প্রশ্ন আবার করলেন প্রফেসর।

'আনুবিস!' অনেক কষ্টে যেন উচ্চারণ করল হুপার। আতঙ্কিত। 'আনুবিস!'

'আনুবিস? আনুবিস, মানে শেয়াল-দেবতা চুরি করেছে মমিটা?'

'আনুবিস!' আবার একটা শব্দই উচ্চারণ করল হুপার। তার পর চোখ বুজল।

খানসামার কপালে হাত রাখলেন প্রফেসর। 'জ্বর। খুব বেশি। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। পুলিশকে ডাকছি না আপাতত। রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠেছে। রা-অরকনের মমি, তার প্রিয় বেড়াল, তারপর আনুবিস! নাহ্, বড় বেশি গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!' আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'কিশোর, তোমাদের ট্যাক্সিটাই নিয়ে যাব। আমার গাড়ি আর বের করছি না। বেড়ালটা তোমাদের কাছেই থাক। হুপার ভাল হোক। ও কিছু বলতে পারলে, নতুনভাবে তদন্ত শুরু করবে। চল।'

হুপারকে ছোট একটা প্রাইভেট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। হাসপাতালের মালিক প্রফেসরের বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে খানসামাকে ভর্তি করে নেয়া হল। কোনরকম অপ্রীতিকর প্রশ্নের সম্মুখীন হলেন না প্রফেসর।

প্রফেসরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ল রবিন আর কিশোর। রকি বীচে ফিরে চলল। রবিনের কোলে বেড়ালটা, মৃদু ঘড়ঘড় করছে মাঝে মাঝেই। তবে নড়াচড়া করছে না, আরাম পেয়েছে।'

'কিশোর,' এক সময় বলল রবিন। 'কি মনে হয় তোমার? রা-অরকন গায়েব হবার সঙ্গে এই বেড়ালটার কোন সম্পর্ক আছে?'

'নিশ্চয়। কিন্তু কি সম্পর্ক, জানি না।'

হতবুদ্ধি হয়ে গেছে কিশোর। তাকে এরকম হতে কখনও দেখেনি রবিন।

'ওদিকে মুসা কি করল, কে জানে!' বলল সে।

'হেডকোয়ার্টারে গিয়ে না পেলে টেলিফোন করব ওর বাড়িতে,' বলল কিশোর। 'ওখানে না থাকলে করব মিসেস চ্যানেলের বাড়িতে। তবে এতক্ষণ সান্তা মনিকায় থাকবে বলে মনে হয় না।'

হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। বিকেলে যেখানে রেখে গিয়েছিল মুসা তার সাইকেলটা, ওখানেই আছে এখনও। মেরিচাচীকে জিজ্ঞেস করে জানল কিশোর, মুসা ফেরেনি। সাইকেলটা রয়েছে, তার মানে বাড়িও ফিরে যায়নি। সান্তা মনিকায় টেলিফোন করল। মিসেস চ্যানেল জানালেন সন্ধ্যার আগেই তাঁর ওখান থেকে বেরিয়ে গেছে মুসা। গেল কোথায়? রাশেদ চাচাকে জিজ্ঞেস করে জানল, সিনেমায় গেছে বোরিস আর রোভার। না, তাদের সঙ্গে মুসাকে দেখেননি তিনি। তাহলে?

'কোথায় যেতে পারে?' উৎকণ্ঠা ফুটেছে রবিনের চেহারায়।

'কি জানি!' কিশোরও উদ্বিগ্ন। 'সান্তা মনিকা থেকে প্রফেসরের বাড়িতে যায়নি তো? বোরিস ফিরলেই জানা যেত।'

'শো ভাঙতে দেরি আছে এখনও,' বলল রবিন। 'চল, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।'

দশ

একটানা ছুটে চলেছে ট্রাক। এবড়ো খেবড়ো অসমতল পথে নেমে এসেছে এখন। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। কফিনের ভেতর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে আছে মুসা আর জামান, নড়তে চড়তে পারছে না খুব একটা। হাড়গোড় গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার অবস্থা।

গুমোট হয়ে আসছে কফিনের ভেতরের বাতাস, বাইরে থেকে খুব একটা ঢুকতে পারছে না। বেশিক্ষণ এই অবস্থায় থাকলে অক্সিজেনের অভাবেই মরতে হবে, ভাবল মুসা।

ভয় পেতে শুরু করেছে দু'জনেই, কিন্তু কেউই প্রকাশ করছে না সেটা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?' একসময় বলল জামান। ফিসফিস করছে, যদিও কোন দরকার নেই। ট্রাকের ইঞ্জিনের প্রচণ্ড আওয়াজ কানে যাবে না ওয়েব কিংবা মেথুর।

'কোথায় কে জানে!' বলল মুসা। 'কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, কোন গোপন জায়গায় নিয়ে লুকিয়ে রাখবে। যে এই কাজের ভার দিয়েছে, তার কাছে ডাবল টাকা চাইবে। টাকা আদায় করার পর তবে দেবে কফিনটা। ভালই। সময় পাব

আমরা। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়ব কফিন থেকে।' বলল বটে, কিন্তু সহজে বেরিয়ে পড়তে পারবে, বিশ্বাস হচ্ছে না তার নিজেরই। যদি দড়ির বাঁধন না খোলে চোরেরা? এখন যেভাবে আছে, তেমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যায়?

'প্রফেসরের বাড়িতে দু'বার আসতে হয়েছে,' বলল ওরা। ফিসফিস করেই বলল জামান। 'কেউ একজনকে পাগল বলল। কিছু বুঝেছ?'

'রা-অরকনের মমি চুরি করতে পাঠানো হয়েছে ওদের,' বলল মুসা। 'সোজা কথা, ভাড়া করা হয়েছে। মমিটা নিয়ে গেছে ওরা। কিন্তু সেই লোক চেয়েছে কফিনসুদ্ধ। তাই আবার পাঠিয়েছে ওদেরকে। ওরা গেছে রেগে। কফিনটা নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রাখবে। ডবল টাকা না পেলে দেবে না ওটা।'

'হুঁ, তাই হবে,' একমত হল জামান। 'কিন্তু রা-অরকনের মমি চুরি করবে কে? কেন? ও আমার দাদা, আর কারও নয়।'

'এটা আরেক রহস্য,' বলল মুসা। 'নিশ্চয় এতক্ষণে একটা নাম দিয়ে ফেলেছে রবিন, নোট লিখে ফেলছে। মমি-রহস্য নামটাই সব চেয়ে উপযুক্ত।'

'রবিন? রবিন কে?'

'তিন গোয়েন্দার একজন।'

'তিন গোয়েন্দা! সেটা আবার কি?' জামানের কণ্ঠে বিস্ময়।

অল্প কথায় জানাল সব মুসা।

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনল জামাল। মুসার কথা শেষ হতেই বলল, 'তোমরা, আমেরিকান ছেলেরা বড় আরামে আছ। আমার দেশে, লিবিয়ায় অনেক কিছুই অন্য রকম। কার্পেটের ব্যবসা আছে আমাদের। বাবা তো আছেনই, আমাকেও দেখাশোনা করতে হয়। তোমাদের মত এত স্বাধীন না, যা খুশি করতে পারি না।...তোমাদের হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে আরও বল। টেপরেকর্ডার, পেরিস্কোপ, আর? রেডিও, টেলিভিশন, এসব নেই?'

'রেডিও!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ইস্‌স, আরও আগে মনে হয়নি কেন! বাইরের সাহায্য চাইতে পারতাম আরও আগেই!'

পকেটেই আছে ছোট ওয়াকি-টকিটা। কফিনের ভেতরে জায়গা বেশি নেই। ওই স্বল্প পরিসরেই কোনমতে শরীর বাঁকিয়ে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল যন্ত্রটা। কোমর থেকে খুলে নিল অ্যান্টেনা। ডালার ফাঁকে যেখানে পেন্সিল ঢুকিয়েছে ওখান দিয়ে বের করে দিল অ্যান্টেনার এক প্রান্ত। তারপর টিপে দিল সুইচ।

'হাল্লো, ফার্স্ট ইনভেস্টিগেটর!' মুখের কাছে ওয়াকি-টকি নিয়ে এসেছে মুসা। সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাচ্ছ? জরুরি! ওভার।'

জবাবের জন্যে কান পেতে রইল মুসা। এক মুহূর্ত নীরবতা। হঠাৎ ধ্বক করে উঠল তার বুকের ভেতর। কথা শোনা গেলঃ হ্যালো টম, শুনতে পাচ্ছ? অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে আমাদের চ্যানেলে।

জবাব দিল দ্বিতীয় একটা গলাঃ হ্যাঁ, জ্যাক। একটা ছেলে। খোকা, যেই হও তুমি, চুপ কর। জরুরি কথা বলছি আমরা। জ্যাক, যা বলছিলাম, পথের মাঝে আটকে গেছি। ট্রাকের টায়ার পাঙ্কচার···

'হেল্প!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'শুনুন, আমার নাম মুসা আমান। রকি বীচের কিশোর পাশার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছি। খুব জরুরি!'

টমের গলা শোনা গেলঃ কার সঙ্গে যোগাযোগ? খোকা, কি বলতে চাইছ তুমি?

'রকি বীচের কিশোর পাশাকে ফোন করুন, প্লীজ,' অনুরোধ জানাল মুসা। 'ওকে বলুন মুসা সাহায্য চাইছে। অত্যন্ত জরুরি।'

জ্যাক বললঃ কি ধরনের জরুরি, খোকা?

'একটা মমির বাক্সে আটকে গেছি,' বলল মুসা। রা-অরকনের মমি। চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ট্রাকে করে। কিশোর সব বুঝতে পারবে। প্লীজ, ফোন করুন তাকে।'

হেসে উঠল জ্যাক। বললঃ টম, শুনলে? এই ছেলেছোকরাগুলোর কথা আর কি বলব? নেশার বড়ি খেয়ে খেয়ে সমাজটাই শেষ হতে বসেছে!

'প্লীজ!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'নেশা করিনি আমি! কিশোরকে ফোন করুন।'

জ্যাক বললঃ খোকা, যা করেছ করেছ, আর দুষ্টুমি কোরো না। সিটিজেন ব্যাণ্ডে গোলমাল পাকালে বিপদে পড়বে। পুলিশ শুনলেই ক্যাঁক করে গিয়ে ধরবে।···টম, অবস্থান জানিয়েছি সাহায্য পাঠাও।

নীরব হয়ে গেল রেডিও।

'হল না, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল হতাশ মুসা। 'অন্য কিছু বলা উচিত ছিল ওদের। টাকা হারিয়ে বিপদে পড়েছি, বা এমনি কিছু। সত্য কথা বলেছি, বিশ্বাস করেনি। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না। মমির বাক্সে ঢুকে আছি, এটা বিশ্বাস করারই কথা।'

'কি আর করবে? তোমার চেষ্টা তুমি করেছ। আর কিছু করার নেই।'

'হ্যাঁ। এমন অবস্থায় হাজার বছরে কেউ একবার পড়ে কিনা সন্দেহ!' কাতর শোনাল মুসার গলা।

খানিকক্ষণ নীরবতা। ছুটে চলেছে ট্রাক। ভাবছে মুসা। তার অবস্থায় পড়লে কিশোর কি করত, বোঝার চেষ্টা করছে। সময়টা কাজে লাগাতে চাইত কিশোর। কিভাবে? প্রশ্ন করে। জামান যা যা জানে, জানার চেষ্টা করত।

'জামান,' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'তুমি লিবিয়ার ছেলে। এত ভাল ইংরেজি শিখলে কি করে?'

'ভাল ইংরেজি বলতে পারি! বলছ? খুশি হলাম,' সন্তুষ্ট শোনাল জামানের গলা। অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে খুশি যে হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। 'আমেরিকান শিক্ষকের কাছে শিখেছি। বড় হলে ব্যবসার

কাজে দেশের বাইরে যাওয়ার দরকার পড়বেই। তাই আমাকে ইংরেজি শিখতে হয়েছে। শুধু ইংরেজি না, ফরাসী আর স্প্যানিশও জানি।' একটু থেমে আবার বলল, 'লিবিয়ায় আমাদের বংশের নাম আছে। বহু পুরুষ ধরে কার্পেটের ব্যবসা করছি আমরা।'

'তা-তো বুঝলাম,' বলল মুসা। 'কিন্তু এসবের মাঝে রা-অরকন আসছে কি করে?' তুমি বলছ, ও তোমাদের পূর্ব পুরুষ। কিন্তু প্রফেসর বেনজামিনের মত, রা-অরকন সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। ও কে ছিল, কি করত, কেউ কিছু জানে না।'

'বইয়ে লেখা নেই, তাই জানে না। তবে কিছু কিছু জ্ঞানী লোক আছেন, যাঁরা দুনিয়ার অনেক কিছু সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন। বই পড়তে হয় না তাঁদেরকে।'

'যেমন?'

'মাস দুই আগে,' বলল জামান। 'এক জ্যোতিষ এসেছিল আমাদের বাড়িতে। বাবাকে বলল, সে স্বপ্নে দেখেছে, কেউ তাকে আমাদের বাড়িতে আসতে বলছে। তাই সে এসেছে। বাবা তাকে আদর-আপ্যায়ান করে বসালেন, খাওয়ালেন। তারপর ধ্যানে বসল জ্যোতিষ। বিড়বিড় করে অদ্ভুত সব কথা বলতে লাগল। একসময় তার মুখ দিয়ে কথা বলে উঠলেন রা-অরকন। তিনি বললেন, শ্বেতাঙ্গ বর্বরদের দেশে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। নিজের দেশে না এলে তাঁর শান্তি নেই। জামান বংশের পূর্বপুরুষ তিনি। কাজেই তাঁকে ফিরিয়ে আনা জামানদেরই কর্তব্য। বর্বরদের দেশে গেলেই রা-অরকনের কথার প্রমাণ পাবেন বাবা। প্রিয় বেড়ালের রূপ ধরে দেখা দেবেন তিনি বাবাকে। কথা শেষ হতেই ধ্যান ভেঙে গেল জ্যোতিষের। আশ্চর্য! রা-অরকন কি কি বলেছে কিছুই বলতে পারল না সে। বাবা সব খুলে বলতেই গম্ভীর হয়ে গেল।'

'কোনকরম ফাঁকিবাজি নেই তো?'

'না না। লোকটাকে দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে। চুল, লম্বা লম্বা দাড়ি, সব ধবধবে সাদা। একটা চোখ অন্ধ। বয়েসের ভারে কুঁজো, লাঠিতে ভর করে হাঁটে। সঙ্গে বোঁঝা ছিল। ওটা থেকে স্ফটিকের একটা বল বের করে কি সব পড়ল বিড়বিড়িয়ে। এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে রইল বলটার দিকে। তারপর অতীত আর ভবিষ্যতের অনেক অদ্ভুত কথা বলে দিল গড়গড় করে।'

'খাইছে! তোমার বাবা কি করলেন তখন?'

'আমাদের ম্যানেজার জলিলকে কায়রো পাঠালেন। সে গিয়ে জেনে এল, সত্যিই কায়রো মিউজিয়মে রাখা ছিল রা-অরকনের মমি। তখন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আমেরিকায়। ক্যালিফোর্নিয়ার এক প্রফেসর হার্বার্ট বেনজামিনের কাছে যাবে। জ্যোতিষ ঠিকই বলেছে। বাবা তখন অসুস্থ। তাই নিজে আসতে পারলেন না। আমাকে আর ম্যানেজারকে পাঠালেন রা-অরকনের খোঁজে। এলাম। খুঁজে খুঁজে বের করলাম প্রফেসরের বাড়ি। তাঁর কাছে গেল ম্যানেজার। মমিটা দিয়ে

দিতে বলল। কিন্তু রাজি হল না বর্বর প্রফেসর। উল্টো গালমন্দ করে জলিলকে বের করে দিল বাড়ি থেকে।'

'শুনেছি,' বলল মুসা। 'প্রফেসর বলেছেন।'

'তখন চুরি করার ফন্দি আঁটল জলিল। এক কোম্পানিকে ধরে মালীর কাজ নিল। প্রফেসরের বাগানের কাজ করতে এসে নজর রাখতে লাগল বাড়িটার ওপর। আমিও রইলাম তার সঙ্গে। চুরি করার বেশ কয়েকটা সুযোগ পেয়েছি আমরা। কিন্তু অচেনা অজানা দেশ, বিদেশ। কাউকে চিনি না। চুরি করার সাহস হল না।'

'কিন্তু চুরির ফন্দি করলে কেন? প্রফেসরের কাছে মমিটা কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিতে পারতে। ভাল টাকা পেলে হয়ত বিক্রি করে দিতেন।'

'রা-অরকন আমার দাদা!' হিমশীতল কণ্ঠ জামানের। 'জোর করে কেউ তাঁকে আটকে রাখবে, আর তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে, কেন? বর্বরদের দেশ কি আর সাধে বলেছি? সে যাই হোক, আমরা পারলাম না শেষ অবধি। অন্য একজন চুরি করে নিল। কিন্তু কে করল কাজটা? কেন?'

ভাবনা চলছে মুসার মাথায়। 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, লোক দিয়ে জলিলই চুরি করিয়েছে মমিটা? তোমাকে না জানিয়ে হয়ত করেছে একাজ।'

'না, তা হতে পারে না। আমাকে জানাতই। আমার সঙ্গে আলোচনা না করে এক পা বাড়ায় না সে। বাবা মারা গেলে আমিই মালিক হব, জানা আছে তাঁর।'

'তাই?' জামানের সঙ্গে ঠিক একমত হতে পারছে না মুসা। 'তো, রা-অরকন যে কথা বলল, এর কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'জানি না! হয়ত রা-অরকন খেপে গিয়েছেন। আমার আর জলিলের ওপরও হয়ত রাগ করেছেন তিনি। নাহ্, এটা সত্যিই এক আজব রহস্য!' গাঢ় অন্ধকার, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান, কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ নীরবতা।

থেমে গেল ট্রাক। কফিনের ভেতর থেকে দু'জনের কানে এল একটা শব্দ, গ্যারেজ কিংবা ওয়্যারহাউসের দরজা খোলা হচ্ছে। আবার নড়ে উঠল ট্রাক। কয়েক গজ এগিয়ে থামল। বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। দরজা নামানর শব্দ শোনা গেল।

ট্রাকের পেছনের ডালা নামানর শব্দ হল। খানিক পরেই তোলা হল কফিনটাকে। বয়ে নিয়ে গিয়ে ধপ্‌প্ করে নামানো হল মেঝেতে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। ভেতরে থেকে ছেলে দুটোর মনে হল, মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে ওদের।

'চল যাই,' শোনা গেল মেথুর গলা। 'এটা থাক এখানেই।'

'থাক,' বলল ওয়েব। 'সকালে ফোন করব মক্কেলকে। বলব, কত চাই আমরা। আজ রাতটা একটু ভাবনা-চিন্তা করেই কাটাক।'

'কিন্তু কাল সকালেও তো পারা যাবে না,' বলল মেথু। 'লং বীচে একটা কাজ করতে হবে, ভুলে গেছ?'

'তাই তো। ঠিক আছে, সকালে না পারলে বিকেলে ফোন করব। নয়ত রাতে। দিনটাও দুশ্চিন্তা করেই কাটাক।'

'কত চাইব, বল তো? দ্বিগুণ নাকি তিন গুণ? জিনিসটা পাওয়ার জন্যে যেরকম উদ্বিগ্ন দেখলাম ওকে, আমার মনে হয় না করতে পারবে না। শেষ অবধি রাজি হয়ে যাবেই।'

'সে দেখা যাবে। চল, যাই এখন।'

আবার দরজা খোলার শব্দ। স্টার্ট হল ইঞ্জিন। পিছিয়ে বেরিয়ে গেল ট্রাকটা।

উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে মুসার বুকের ভেতর। ঠেলা দিয়ে দেখল কফিনের ডালায়। নড়াতে পারল না ঢাকনা। বড় বেশি শক্ত দড়ির বাঁধন।

এগারো

হেডক্যোয়ার্টার। খটাখট টাইপ করছে রবিন। নোট লিখছে।

আজব বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে তার চেয়ারে বসে আছে কিশোর। চিন্তিত। আলত চাপড় দিচ্ছে বেড়ালের গায়ে। মৃদু ঘড়ঘড় করে আনন্দ প্রকাশ করছে ওটা।

'সেরেছে!' টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলেছে রবিন। 'দশটা বাজতে পাঁচ! মুসার কি হল?'

'হয়ত কোন সূত্র পেয়ে গেছে,' বলল কিশোর। 'তদন্তের কাজে ব্যস্ত।'

'কিন্তু যেখানেই যাক, দশটার মধ্যে বাড়ি ফেরার কথা তার। আমারও তাই। বেশি দেরি করলে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়ে যাবে বাড়িতে।'

'ফোন করে বলে দাও, ফিরতে আরও খানিক দেরি হবে। ইতিমধ্যে এসে যাবে মুসা।'

ফোন ধরলেন রবিনের মা। আরও আধঘন্টা থাকার অনুমতি দিলেন ছেলেকে।

বেড়ালটাকে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল কিশোর। গিয়ে চোখ রাখল পেরিস্কোপে। ইয়ার্ডের গেটে আলো। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থেকেও আলো এসে পড়ছে চত্বরে। নীরব, নির্জন। মেরিচাচীর ঘরে আলো জ্বলল। টেলিভিশন দেখছেন চাচা-চাচী। বোরিস আর রোভারের কোয়ার্টার অন্ধকার। সিনেমা থেকে এখনও ফেরেনি ওরা।

আবার রাস্তার দিকে পেরিস্কোপ ঘোরাল কিশোর। একটা গাড়ি এগিয়ে আসছে। গেটের কাছে এসে গতি কমাল। একটা নীল স্পোর্টস কার। ড্রাইভারের আসনে বসে আছে লম্বা শুকনো এক কিশোর। মুখ ফিরিয়ে ইয়ার্ডের দিকে তাকাল

ছেলেটা। তারপর আবার এগোল। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চেয়ারে ফিরে এল কিশোর। 'মুসার কোন চিহ্ন নেই,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু শুটকো টেরি শহরে ফিরে এসেছে। জ্বালাবে।'

'তাই নাকি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তাহলে গেল আমাদের শান্তি!'

'গেটের কাছে থেমেছিল। জানা কথা, আমাদেরকে খুঁজছে।'

'বেশি বাড়াবাড়ি করলে এবার ধরে পেটাব। ব্যাটা জন্মের শয়তান!' আবার টাইপে মন দিল রবিন।

সময় যাচ্ছে। মুসার জন্যে ভাবনা বাড়ছে দু'জনের।

'আর আধ ঘন্টা অপেক্ষা করব,' অবশেষে বলল কিশোর। 'তারপর কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।'

টাইপ থামিয়ে দিয়েছে রবিন। 'কিশোর, কোন বিপদে পড়েনি তো মুসা? একটা টেলিফোনও তো করতে পারত!...কিশোর, ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগের চেষ্টা করছ না তো!'

'তাই তো!' প্রায় লাফিয়ে উঠল কিশোর। টেবিলে রাখা লাউডস্পীকারের সঙ্গে ওয়াকি-টকির যোগাযোগ করে দিয়ে সুইচ টিপল। 'হেডকোয়ার্টার ডাকছে সহকারীকে! সেকেণ্ড, শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? সেকেণ্ড!'

স্পীকারের মৃদু গুঞ্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

আবার চেষ্টা করল কিশোর। বৃথা। 'নাহ্,' মাথা নাড়ল সে। 'চেষ্টা করছে না মুসা। কিংবা রেঞ্জের বাইরে রয়েছে। রবিন, রাত অনেক হয়ে গেছে। তুমি বাড়ি চলে যাও। আমি থাকছি এখানেই।'

অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল রবিন। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল ইয়ার্ড থেকে।

বাড়িতে ঢুকল রবিন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। বাবার ডাক শুনতেই পেল না।

'রবিন?' আবার ডাকলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এত কি ভাবছিস রে? স্কুল তো ছুটি পরীক্ষা-টরীক্ষা নেই।'

মুখ তুলে তাকাল রবিন। বাবার দিকে এগোল। 'বাবা, একটা সমস্যায় পড়েছি! একটা রহস্য।'

'বলবি নাকি আমাকে?'

'বাবা, একটা বেড়াল, দুটো চোখ দুই রঙের।' একটা সোফায় বসে পড়ল রবিন। 'নীল আর কমলা।'

'হুঁম্‌ম্!' আস্তে মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড। পাইপে তামাক ঠেসে আগুন ধরালেন।

'কিন্তু, বাবা, আসল সমস্যা বেড়ালটা নয়। একটা মমি। তিন হাজার বছরের

পুরানো। ওটা কথা বলে!'

'তাই নাকি?' পাইপে টান দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। হাসলেন। 'এটা একটা সমস্যা হল? মমিকে কথা বলানো সহজ। পুতুল নাচ দেখিসনি? পুতুলকে কি করে কথা বলায় ওরা?'

চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল রবিন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে।

'বুঝলি না?' আবার পাইপে টান দিল মিস্টার মিলফোর্ড। 'ভেনট্রিলোকুইজম। যুক্তির ভেতরে আয়। মমি হল মরা শুকনো লাশ, ওটার কথা বলার প্রশ্নই ওঠে না। তার মানে, মমিটার হয়ে কোন একজন মানুষ কথা বলে। সুতরাং, রহস্যের সমাধান করতে হলে আশেপাশে এমন একজন প্রতিবেশীর খোঁজ কর গিয়ে, যে ভেন্ট্রিলোকুইজম জানে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রবিন। ফোনের দিকে ছুটল। কিশোরকে জানাতে হবে। পেছনে চাইলে দেখতে পেত, হাসিতে ভরে গেছে বাবার মুখ। ছেলেবেলায় তিনিও রবিনের মতই চঞ্চল ছিলেন। ছেলের মতিগতি তাই খুব ভাল করেই বোঝেন।

দ্রুতহাতে ডায়াল করল রবিন। প্রথম রিঙের সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। রবিনের সাড়া পেয়ে হতাশ মনে হল তাকে। 'আমি ভেবেছিলাম, মুসা! তো, কি খবর, রবিন? মুসার খবর জানতে চাইছ তো?'

'বুঝতেই পারছি, ওর কোন খবর নেই,' বলল রবিন। 'কিশোর, মমির ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছি। বলল, ব্যাপারটা ভেন্ট্রিলো-কুইজমের কারসাজি। প্রফেসরের কোন প্রতিবেশীর কাজ।'

'সেটা আগেই ভেবেছি আমি,' খুব একটা উৎসাহ দেখাল না কিশোর। 'প্রফেসরের বাড়ির কাছাকাছি কোন প্রতিবেশী নেই।'

'তবু, ভেবে দেখ,' ভেবেছিল সাংঘাতিক একটা তথ্য দিয়ে চমকে দেবে কিশোরকে, হাতাশই হল রবিন। 'হয়ত জাদুঘরের ঠিক বাইরে, কিংবা দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকে লোকটা। ওখান থেকে কফিন লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয় কথা।...যাক গে, মুসার কি অবস্থা? প্রফেসরের বাড়িতে একবার ফোন করে দেখ না। আমরা চলে আসার পর গিয়েও থাকতে পারে।'

'তাই করব এখন,' বলল কিশোর। 'আর হ্যাঁ, ভেন্ট্রিলোকুইজম নিয়ে আরও ভাবব। একেবারে বাতিল করে দেয়া যায় না সম্ভাবনাটা এখনই।...গুড নাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রবিন। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কাপড় ছেড়ে বিছানায় গেল। কিন্তু ঘুম আসছে না। হাজারটা ভাবনা এসে ভিড় করছে মনে। সবচেয়ে বেশি ভাবছে মুসার কথা। কোন বিপদে পড়ল না তো? রা-অরকনের অভিশাপ তারই ওপর নামল না তো প্রথম...

অভিশাপ নামেনি, তবে মস্ত বিপদেই আছে মুসা আর জামান। দু'জনে প্রাণপণ

চেষ্টা চালাচ্ছে ডালা খোলার! কিন্তু এতই শক্ত বাঁধন, একটুও ঢিল হচ্ছে না।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ট্রাকটা তখনও, ইঞ্জিনের শব্দেই বোঝা যাচ্ছে। হঠাৎ থেমে গেল ইঞ্জিনের শব্দ। পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। নিশ্চয় আবার ফিরে আসছে দুই চোর। কেন?

'ভাল কথাই মনে করেছ,' মেথুর গলা। 'দিনের বেলা কেউ ঢুকলে এটা চোখে পড়বেই। একটা কফিন পড়ে আছে দেখলে কৌতূহলী হয়ে উঠবে। ক্যানভাস দিয়ে ঢেকে রাখাই ভাল।'

'সেটাই তো বোঝানর চেষ্টা করছি,' বলল ওয়েব। 'ঢাকা দেখলে কেউ ফিরেও তাকাবে না। ভাববে ট্রাকের কোন মাল।'

'কাম সারছে!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এতক্ষণ তো বাতাস পেয়েছি, এবার সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে! দম বন্ধ হয়েই মরব! তারচেয়ে চেঁচিয়ে উঠি! কয়েকটা চড়থাপ্পড় দিয়ে ছেড়ে দিতেও পারে!'

'আমিও সে কথাই ভাবছি!' বলল জামান

চেঁচানর জন্যে মুখ খুলেও থেমে গেল মুসা। একটা বিশেষ কথা কানে ঢুকেছে।

বারো

'ওয়েব,' বলছে মেথু। 'দড়িটা খুলে নাও আগে। কাল দরকার পড়বে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' বলল ওয়েব। 'খুলে নিচ্ছি।'

দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল মুসা আর জামান। দড়ি খোলার শব্দ শুনল। কফিনের ওপর ক্যানভাস টেনে দেয়ার খসখস আওয়াজ আসছে।

আবার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। খানিক পরেই শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। চলে গেল ট্রাক।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল মুসা। তারপর ঠেলা দিল ডালায়। তার সঙ্গে হাত লাগাল জামান। ডালা খুলে গেল। তবু অন্ধকার। ক্যানভাসে ঢাকা রয়েছে। দাঁড়িয়ে উঠে ঠেলে ক্যানভাস সরিয়ে ফেলল মুসা, জামান বেরিয়ে গেল আগে। তারপর বেরোল সে।

অন্ধকার। মাথার ওপরে স্কাইলাইট। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের হালকা আলো আসছে। ঘরের জিনিসপত্র আবছা চোখে পড়ল ওদের। একটা স্টোররুম। উঁচু ছাদ, কংক্রীটের দেয়াল, কোন জানালা নেই। বড় একটা লোহার দরজা। ধাক্কা দিল। বাইরে থেকে শক্ত করে আটকানো। ঝন ঝন আওয়াজ হল শুধু। খুলল না।

ঘরে কি কি আছে জানার চেষ্টা করল মুসা আর জামান। বেরিয়ে যাওয়ার উপায় খুঁজছে। আধো অন্ধকার। ভালমত দেখা যাচ্ছে না। কিছু দেখে কিছু হাতের

আন্দাজে খোঁজাখুঁজি চালাল ওরা। প্রথমেই চোখে পড়ল একটা পুরানো মটরগাড়ি। বোঝা গেল, ওটা একটা প্রাচীন পিয়ার্স-অ্যারো সিডান। ঝরঝরে হয়ে গেছে।

'পুরানো মোটরগাড়ি!' জামানের কণ্ঠে বিস্ময়। 'এটা এখানে কেন?'

'কেউ সংগ্রহ করে রেখেছে হয়ত। উনিশশো বিশ সালের জিনিস হবে। সংগ্রাহকদের কাছে খুব দামি।'

এরপর কিছু পুরানো আসবাবপত্র দেখল। ভারি! সূক্ষ্ম কারুকাজ—আঙুল চালিয়ে দেখে বুঝল। জিনিসগুলো রাখা আছে একটা কাঠের মঞ্চের ওপর।

'শুকনো রাখার জন্যে,' জামানকে বলল মুসা। 'জমা করে রাখা হয়েছে।... কিন্তু এগুলো কি?...গাদা করে রাখা?'

ছুঁয়ে দেখল জামান। রোল পাকিয়ে জিনিসগুলো একটার ওপর আরেকটা রেখে পিরামিড বানিয়ে ফেলা হয়েছে যেন। 'কার্পেট! মধ্যপ্রাচ্যের জিনিস! খুবই ভাল, অনেক দামি!'

'কি করে বুঝলে?' মুসা অবাক। 'ভালমত দেখাই যাচ্ছে না।'

'আট বছর বয়েস থেকেই কার্পেট ঘাঁটাঘাঁটি করছি। এগুলো তো আবছামত দেখা যাচ্ছে। না দেখে শুধু ছুঁয়েই বলে দিতে পারি কোনটা কেমন কার্পেট, কি ধরনের সুতো দিয়ে বানানো, বুনট কেমন। আমাদের কোম্পানির জিনিস নয় এগুলো। তবে দামি। একেকটা দু'তিন হাজার ডলারের কম হবে না।'

'ওরেব্বাবা! নিশ্চয় চুরি করে আনা হয়েছে,' বলল মুসা। 'বাজি ধরে বলতে পারি, এই ঘরের সব জিনিসই চোরাই মাল। ওয়েব আর মেথু, দুই ব্যাটাই পেশাদার চোর। এজন্যেই রা-অরকন আর কফিনটা চুরি করার জন্যে ওদেরকে ডাকা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' একমত হল জামান। 'কিন্তু এখন এখান থেকে বেরোই কি করে?'

'এই যে, আরেকটা দরজা!' অন্ধকারে প্রায় ঢাকা পড়েছিল ছোট দরজাটা। একটা দেয়াল, বোধহয় অন্য ঘরগুলো থেকে আলাদা করে রেখেছে স্টোর রুমটাকে।

হাতল ধরে টান দিল মুসা। খুলল না দরজা। আরেকটা দরজা খুঁজে পেল ওরা। ওটা বাথরুমের।

'মনে হয়,' মুসা বলল। 'ঘরটা তৈরিই হয়েছে চোরাই মাল রাখার জন্যে। দরজাগুলোও তৈরি হয়েছে সে কথা চিন্তা করেই। মেথু আর ওয়েব জানে কি করে ঢুকতে হয়, বেরোতে হয়। কিন্তু আমরা বেরোই কি করে?' ওপরের দিকে চেয়ে কি ভাবল। 'ওখান দিয়ে যাওয়া যাবে!' বলল আপনমনেই।

'যাবে, যদি উড়তে পার।'

'না উড়েও হয়ত পারব। এস, চেষ্টা করে দেখি। গাড়িটা...স্কাইলাইটের ঠিক

নিচে রয়েছে।'

'ঠিক!' উত্তেজিত হয়ে পড়েছে জামান। 'চল উঠে দেখি। নাগাল পাই কিনা!'

'ধীরে বন্ধু ধীরে,' জামানের হাত চেপে ধরেছে মুসা। 'এত তাড়াহুড়া কোরো না। জুতোর সুখতলার ঘষায় রঙ ছাল তুলে ফেলবে। গাড়িটার অ্যানটিক মূল্যই খতম হয়ে যাবে।'

জুতো খুলে নিল দু'জনেই। একটার সঙ্গে আরেকটার ফিতে বেঁধে যার যার জুতো গলায় ঝুলিয়ে নিল। বেয়ে উঠে পড়ল গাড়ির ছাদে। কিন্তু দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাত টান টান করে তুলে দিয়েও নাগাল পেল না মুসা। আরও ফুটখানেক ওপরে থেকে যায় স্কাইলাইট।

'লাফিয়ে ধরার চেষ্টা করব,' বলল মুসা। 'যে করে হোক বেরোতেই হবে এখান থেকে।'

লাফ দিল মুসা। আঙুলে ঠেকল স্কাইলাইটের ধাতব কিনারা। আঁকড়ে ধরল। ঠেলে খুলে ফেলতে একটা মুহূর্ত ব্যয় করল। দু'হাতে ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। বেরিয়ে এল ধুলোবালিতে ঢাকা ছাদে। বসে পড়ে একটা হাত বাড়িয়ে দিল নিচে। 'লাফ দাও, জামান! আমার কব্জি চেপে ধর।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল জামান। নিচে কংক্রীটের মেঝের দিকে তাকাল একবার। তারপর আবার মুখ তুলল। লাফ দিল হঠাৎ। তার আঙুল ছুঁল মুসার হাত। কিন্তু আঁকড়ে ধরে রাখতে পারছে না, পিছলে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্তে জামানের কব্জি ধরে ফেলল মুসা। টেনে তুলে আনল ওপরে।

'প্রচণ্ড শক্তি তোমার গায়ে, মুসা! দুঃসাহসীও বটে! গোয়েন্দা হওয়ারই উপযুক্ত তুমি।'

'হয়েছে হয়েছে, প্রশংসা থামাও,' হাত তুলল মুসা। 'ফুলে ফেঁপে শেষে পেট ফেটেই মরব।' গলায় ঝোলানো জুতো নামিয়ে এনে ফিতে খুলতে শুরু করল। 'জলদি খোল! এখানে সারা রাত দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না।'

বিল্ডিঙের পেছন দিকে ছাতে ওঠার লোহার সিঁড়ি। অন্ধকার একটা সরু গলিতে নেমে এল ওরা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। কেউ আসছে কিনা কিংবা লক্ষ্য করছে কিনা, দেখল। কেউ নেই। নির্জন।

পকেট থেকে নীল চক বের করল মুসা। লোহার বড় দরজাটা খুঁজে বের করল। ওটার নিচে বাঁ দিকে চক দিয়ে বড় বড় কয়েকটা প্রশ্নবোধক আঁকল। 'আমাদের বিশেষ চিহ্ন,' সঙ্গীকে বলল সে। 'আগামীকাল ফিরে আসব। চিহ্ন দেখেই বুঝতে পারব, কফিনটা কোথায় রয়েছে। চল, মোড়ের ওদিকে গিয়ে এই রাস্তার নাম দেখি।...আরে, কে জানি আসছে! চোর-টোর না তো!'

গলি ধরে দ্রুত উল্টো দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা। মোড় নিয়ে দুটো দোকানের মাঝের অন্ধকার গলি ধরে বেরিয়ে এল অন্য পাশে। কানা গলিই বলা

চলে এটাকে। ল্যাম্পপোস্ট নেই। একটা দোকানের দরজার কপালে জ্বলছে ম্লান আলো, তাতে বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারল মুসা, 'এই অঞ্চলে আগে কখনও আসেনি। একেবারেই অচেনা।

'কোথায় এসেছি, যেভাবেই হোক জানা দরকার,' বলল মুসা। জামানের হাত ধরে টানল, 'এস, ওই মোড়টায় চলে যাই। ফলকে নিশ্চয় রাস্তার নাম লেখা আছে।'

ফলকটা পাওয়া গেল ঠিকই, কিন্তু নাম পড়ার উপায় নেই। অনেক দূরে ল্যাম্পপোস্ট, আলো ঠিকমত পৌঁছাচ্ছে না এখানে। তাছাড়া ফলকটার ওপর কাদা লেপে দিয়েছে বোধহয় কোন দুষ্ট ছেলে।

'বদমাশ ছেলেগুলোকে ধরে পেটানো উচিত!' বিড়বিড় করল মুসা আপন-মনেই। আরও কিছু একটা বলতে গিয়েই থেমে গেল।

যে গলি থেকে বেরিয়েছে ওরা, ওটার শেষ মাথায় কাচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজ উঠল। চেঁচিয়ে উঠল কেউ। ছুটে এল দুটো লোক। ল্যাম্পপোস্টের কাছ থেকে খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাড়িতে গিয়ে ঢুকল। স্টার্ট দিয়ে মুসা আর জামানের পাশ দিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই পেছনে চিৎকার শুনল ওরা। 'চোর! চোর!' বিশালদেহী এক লোক ছুটে আসছে। ছেলেদেরকে দেখেই ঘুসি পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হারামজাদা, বদমাশেরা! চোর! আমার জানালা ভেঙেছিস! চুরি করেছিস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!'

লোকটার চেঁচামেচিতে কয়েকটা বাড়ির দরজা খুলে গেছে। বেরিয়ে এসেছে আরও কয়েকজন লোক। সবাই ছুটে আসছে।

খপ করে জামানের হাত চেপে ধরল মুসা। 'দৌড় দাও! ধরতে পারলে হাড় গুঁড়ো করে ফেলবে!'

ছুটল ওরা। এ-গলি, ও-গলি, এ-রাস্তা সে-রাস্তা এ-বাড়ির পাশ, ও-দোকানের কোণ পেরিয়ে এসে পড়ল একটা বড় রাস্তায়। পেছনে তখনও তাড়া করে আসছে লোক। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে দুটো কুকুর। হাঁপাচ্ছে মুসা আর জামান। আর বেশিক্ষণ পারবে না। বুকের ভেতর ভীষণ লাফালাফি করছে হৃৎপিণ্ড। তবু থামল না ওরা। ছুটে ঢুকে পড়ল আরেক গলিতে।

অবশেষে তাড়া করে আসা লোকদেরকে হারিয়ে দিল ওরা। ততক্ষণে দম ফুরিয়ে গেছে একেবারে। ধপ করে পথের ওপরই বসে পড়ল দু'জনে। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।

'খামোকা···দৌড়েছি!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা। 'আমরা চোর নই, জানালাও ভাঙিনি···ওদেরকে সে কথা বুঝিয়ে বললেই হত!'

'হত না,' বলল জামান। 'চোর বলে কেউ তেড়ে এলে প্রথম কাজ ছুট

লাগানো। ঠিকই করেছ। ওরা হয়ত বুঝত শেষ অবধি, কিন্তু ততক্ষণে কিল খেয়ে থেঁতলে যেত আমাদের শরীর। ঠিকই হয়েছে, ছুট লাগিয়েছি।'

'কিন্তু···কাজটা খারাপ হয়ে গেল,' তিক্ত কণ্ঠ মুসার। 'কোন জায়গা থেকে ছুট লাগিয়েছি, জানি না। কোথায় কোনদিকে ছুটেছি, তা-ও বলতে পারব না। স্টোর-হাউসটা কোথায় সামান্যতম ধারণাও নেই!'

'আমারও না,' হতাশ মনে হল জামানকে। 'পড়লাম আরেক সমস্যায়, তাই না?'

'তাই,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আবার কি করে খুঁজে পাব বাড়িটা? বাড়িই বা ফিরব কি করে? রকি বীচ থেকে কম করে হলেও পনেরো মাইল দূরে রয়েছি আমরা। হলিউড থেকে মাইল দশেক। জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলী বলেই মনে হচ্ছে।'

'ট্যাক্সি নিতে পারি,' বলল জামান।

'তা পারি,' বলল মুসা। 'কিন্তু আমার পকেটে যা আছে তাতে কুলাবে না।'

'আমার কাছে আছে,' আশ্বাস দিল জামান। 'অনেক টাকা আছে। আমেরিকান ডলার।' বেশ পুরু একটা নোটের তাড়া বের করে দেখাল সে।

'ভাল,' উঠে দাঁড়াল মুসা। আঙুল তুলে একটা দিক দেখাল। 'আলো। শহর নিশ্চয়। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ওদিকে।'

দ্রুত এগিয়ে চলল দু'জনে। মোড়ের কাছে একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড। ভাড়া দিতে পারবে?—ছেলেদের দেখে সন্দেহ প্রকাশ করল ড্রাইভার। জামান নোটের তাড়া দেখাতেই নেমে এসে পেছনের দরজা খুলে ধরল।

গাড়িতে চড়ার আগে আশেপাশের এলাকা সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে নিল। অনুমান করল, পনেরো-বিশ ব্লক দূরে রয়েছে স্টোর-হাউসটা। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে এগিয়ে গেল একটা পাবলিক ফোন-বুদের দিকে।

প্রথমবারই রিঙ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলে নিল কিশোর।

'মুসা,' বলল গোয়েন্দাসহকারী। 'ভালই আছি। বাড়ি রওনা হচ্ছি এখনই। অনেক কিছু বলার আছে তোমাকে। বাড়ি থেকে ফোনে জানাব।'

'ওয়াকি-টকি ব্যবহার কর,' বলল কিশোর। 'আমি আমার ঘরে অপেক্ষা করব। তোমার সাড়া পেয়ে খুব খুশি লাগছে, সেকেণ্ড।'

কিশোরের গলা শুনেই বুঝতে পারছে, সত্যিই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল গোয়েন্দাপ্রধান। খুশি হয়েছে এখন ঠিকই। তবে খুশি বেশিক্ষণ থাকবে না, ভাবল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, দেখেছে মুসা, অথচ ঠিকানা বলতে পারবে না জানতে পারলে, কিশোরের চেহারা কেমন হবে, মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

গাড়িতে গিয়ে উঠল মুসা। জামান আগেই উঠে বসে আছে।

পথে আর কোন রকম কিছু ঘটল না। নিরাপদেই বাড়ি পৌঁছল মুসা। জামান নামল না ট্যাক্সি থেকে। সে চলে যাবে প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ির কাছাকাছি, যে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে জলিল, সেখানে। সেখানেই উঠেছে ওরা এদেশে এসে।

গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছিল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল জামান। 'মুসা, তোমরা সাহায্য করবে আমাকে? রা-অরকন আর তাঁর কফিনটা খুঁজে বের করতেই হবে। যদি বল, তোমাদের সার্ভিস ভাড়া করতে রাজি আছি আমি।'

'ভুল করছ তুমি, জামান,' বলল মুসা। 'টাকার বিনিময়ে কারও কাজ করি না আমরা। করি স্রেফ শখে। তাছাড়া কাজটা হাতে নিয়েছি আমরা আগেই, প্রফেসর বেনজামিনের অনুরোধে।'

'জামানের জন্যেও কাজটা কর,' অনুরোধ করল জামান। 'রা-অরকন আর কফিনটা খুঁজে বের করে প্রফেসরকে ফিরিয়ে দাও। আবার আমি আর জলিল যাব তার কাছে। আবার চাইব তার কাছে মমিটা। অনুরোধে কাজ না হলে অন্য উপায় দেখব।'

'সেটা করা যেতে পারে,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আগামীকাল সকাল দশটায় পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে হাজির থেক। কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।'

সায় জানাল জামান। হাত মেলাল দু'জনে। মুসা নামতেই ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

বাড়িতে ঢুকল মুসা। বসার ঘরে টেলিভিশন দেখছেন বাবা-মা।

'এত দেরি কেন, মুসা?' ছেলেকে দেখেই বলে উঠল মিস্টার আমান।

'ভাবনায় ফেলে দিয়েছিলে। তোমার মা-তো অস্থির হয়ে উঠেছে।'

'বাবা,' কৈফিয়ত দিচ্ছে যেন মুসা, 'একটা কেসে কাজ করছি আমরা। হারানো একটা বেড়াল খুঁজতে গিয়েছিলাম। তারপর...'

'হয়েছে, আর ওসব শুনতে চাই না,' কড়া গলায় বললেন মা। 'চেহারা আর কাপড়-চোপড়ের যা হাল করেছ! খানা-খন্দে পড়ে গিয়েছিলে নাকি? যাও, জলদি গোসল সেরে ঘুমাতে যাও।'

'যাচ্ছি, মা,' আরও কিছু গালমন্দ শোনার আগেই ছুট লাগাল মুসা। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়, নিজের ঘরে। জানালা খুলে দিয়ে চেয়ার টেনে বসল। অ্যান্টেনাটা জানালার বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে সুইচ টিপল ওয়াকি-টকির। 'সেকেণ্ড বলছি...সেকেণ্ড বলছি।...শুনতে পাচ্ছ, ফার্স্ট?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল, 'ফার্স্ট বলছি। তুমি কেমন আছ, মুসা? কি হয়েছিল?'

দ্রুত সংক্ষেপে সব জানাল মুসা। কফিনটা কোথায় আছে, ঠিকানা বলতে পারবে না, তা জানাল সব শেষে।

ওপাশে একটা মুহূর্ত নীরবতা।

'খামোকা দোষ দিয়ো না নিজেকে,' বলল কিশোর। 'তোমার আর কিছু করার ছিল না। কফিনটা খুঁজে বের করবই আমরা। সকালে আলোচনায় বসব। আরও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া গেছে। রহস্যের সমাধান তো হয়নিই! বরং আরও জটিল হয়েছে। তবে, জামান যে বলছে বেড়ালটা রা-অরকনের তা ঠিক নয়। বেড়ালটা সত্যিই মিসেস ভেরা চ্যানেলের।' আর কোন কথা না বলে চ্যানেল অফ করে দিল সে।

ধীরে সুস্থে গোসল সেরে বিছানায় উঠল মুসা। নতুন আরেক সমস্যায় ফেলে দিয়েছে তাকে কিশোর। প্রচণ্ড কৌতূহল কিছুতেই চাপা দিতে পারছে না, অথচ কিছু করারও নেই। এত রাতে আর কিশোরের ওখানে যেতে পারবে না।

মিসেস চ্যানেলের বেড়ালের পা ছিল সাদা, পাওয়া গেছে যেটা, সেটার কালো। তাহলে ওটা ওই মহিলার বেড়াল হয় কি করে?

তেরো

হেডকোয়ার্টারে জড় হয়েছে ওরা। কৌতূহলে ফেটে পড়ার জোগাড় মুসা আর রবিনের। কিন্তু কিশোরের নির্লিপ্ত ভাবভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছে, এত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবে না গোয়েন্দাপ্রধান।

'আন্দাজে কিছু বলা পছন্দ নয় আমার,' বলল কিশোর। 'কাজেই এখন কিছু বলতে চাই না। জামান আসুক, তার সঙ্গে কথা বলে নিই আগে। যে ক'টা ব্যাপারে শিওর হয়েছি, সবার সামনেই বলব তখন।'

দশটা বাজল। উঠে গিয়ে পেরিস্কোপে চোখ রাখল মুসা। একটা ট্যাক্সি এসে ইয়ার্ডের গেটে থেমেছে। ওটা থেকে বেরিয়ে এল জামান। তাড়াহুড়ো করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে গেল মুসা। অতিথিকে নিয়ে আবার একই পথে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে। জামান মক্কেল, তাতে গোপন জায়গায় আনা যায়, এক নম্বার কথা। দু'নম্বার, সারাজীবন আমেরিকায় থাকছে না সে, লিবিয়ায় ফিরে যাবে শিগগিরই। কাজেই ফাঁস করে দেবে আস্তানার খবর, এমন ভয় নেই।

'জামান,' পরিচয় করিয়ে দিল মুসা, 'রবিন মিলফোর্ড, রেকর্ড রাখা আর গবেষণার দায়িত্বে আছে। আর এ হল গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা।'

'তোমাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম,' একে একে কিশোর আর রবিনের সঙ্গে হাত মেলাল জামান।

'এবার কাজের কথায় আসা যাক,' বলল কিশোর। 'মুসা, গত বিকেলে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোনর পর যা যা ঘটেছে, সব খুলে বল। কিছুই বাদ দেবে না। রবিন, নোট নাও।'

একে একে সব বলে গেল মুসা। শর্টহ্যাণ্ডে নোট নিল রবিন। কিশোর

গতরাতেই শুনেছে সব কথা, যদিও সংক্ষেপে। কিন্তু সে এই প্রথম শুনল।

'সেরেছে!' মুসার কথা শেষ হতেই বলে উঠল রবিন। 'সত্যিই বলতে পারবে না স্টোর হাউসটা কোথায়?'

'কি ছোটা ছুটেছি, বলে বোঝাতে পারব না,' গতরাতের কথা মনে করে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'থেমে রাস্তার নাম দেখার সময় কোথায়! পালিয়েছি কোনমতে! ধরতে পারলে আর আস্ত রাখত না। তবে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ড থেকে বিশ ব্লক দূরে হবে জায়গাটা।'

'বিশ ব্লক!' আঁতকে উঠল রবিন। 'একেক সারিতে বিশটা করে ধরলেও চারশো ব্লক খুঁজতে হবে! তারমানে চারশো গলি। আর একেক ব্লকে যতটা বাড়ি, ততগুলো উপগলি! নাহ্, অসম্ভব মনে হচ্ছে...'

'ভুলে যাচ্ছ কেন?' বাধা দিয়ে বলল মুসা, 'স্টোর হাউসের দরজায় চিহ্ন এঁকে দিয়ে এসেছি।'

'ঠিক,' সায় দিল কিশোর। 'তাতে কাজ অনেক সহজ হবে।'

'কিন্তু হাতে আমাদের সময় নেই বেশি,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'বড়জোর আজ বিকেল পর্যন্ত। এর মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে বাড়িটা। কি করে সম্ভব?'

'একটা প্ল্যান এসেছে আমার মাথায়,' বলল কিশোর। 'সেই মাফিক কাজ শুরু করে দিয়েছি। তবে তাতেও মোটামুটি সময় লাগবে। তার আগে এস, আলোচনা করে দেখি কি করে মমি রহস্যের সমাধান করা যায়।'

'সত্যি রা-অরকনের মমি খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না জামান। 'কোন উপায় জানা আছে? ফিরে পাব আমাদের পূর্বপুরুষকে?'

'নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে ফিরে তাকাল কিশোর। 'এখনও জানি না। তবে একটু ভুল শুধরে দেয়া দরকার, জামান। রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ নন, অন্তত এখন আমার তাই মনে হচ্ছে।'

রেগে উঠল জামান। 'কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল! ও ভাঁওতা দেয়নি! তাছাড়া, ও নিজে কিছু বলেনি। ধ্যানে বসেছিল। ওর মুখ দিয়ে কথা বলছেন রা-অরকন। যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী ওই জ্যোতিষ। তার প্রমাণ পেয়েছি আমরা।'

'একটা কথা ঠিক,' বলল কিশোর। 'তিন হাজার বছর আগে মিশর শাসন করেছিল লিবিয়ানরা।'

'এবং রা-অরকন ছিলেন লিবিয়ান, রাজার ছেলে,' জোরাল কণ্ঠে ঘোষণা করল জামান। 'জ্যোতিষ তাই বলেছে।'

'তা বলেছে! কিন্তু কতখানি সত্যি, কে জানে! প্রফেসর বেনজামিনের মত অভিজ্ঞ লোকও জানেন না, রা-অরকন সত্যিই কে ছিলেন? ঠিক কত বছর আগে কবর দেয়া হয়েছিল তাঁকে। হতে পারে তিনি লিবিয়ান। কিন্তু তার অর্থ এই নয়.

তিনি তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেনই।'

'কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল!' জেদ ধরে বসেছে যেন জামান। 'মস্ত বড় জ্যোতিষ ওই লোক, তার কথা মিথ্যে হতে পারে না।'

'কে বলল? বেড়ালটার ব্যাপারেই মিথ্যে বলেছে সে। অন্তত ঠিক কথা বলতে পারেনি।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না!' ভ্রূকুটি করল জামান।

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বলল কিশোর। 'জ্যোতিষ বলেছে, রা-অরকনের আত্মা তার প্রিয় বিড়ালের রূপ ধরে দেখা দেবে তোমাদেরকে। বেড়ালটা আবিসিনিয়ান, চোখের রঙে বৈশাদৃশ্য, সামনের দু'পা কালো। এই তো?'

'হ্যাঁ,' গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলল জামান। 'দেখা দিয়েছে ও। গত হপ্তার এক রাতে রহস্যজনভাবে আমার ঘরে এসে হাজির হল রা-অরকনের আত্মা, বেড়ালের রূপ ধরে।'

'তাই, না?' উঠল কিশোর। 'একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাকে।' ছোট্ট গবেষণাগারে গিয়ে ঢুকল সে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাতে সেই বেড়ালটা।

'রা-অরকন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জামান 'আমার সম্মানিত পূর্বপুরুষ, বহাল তবিয়তেই আছে।'

'প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে, একটা ঝোপ থেকে বেরিয়েছিল গতরাতে,' বলল কিশোর। 'নিয়ে এসেছি আমরা। এবার দেখ।' পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল সে। বেড়ালটার সামনে এক পায়ের কালো অংশে জোরে জোরে ডলতে লাগল। সাদা রুমালে কালো দাগ লেগে যাচ্ছে। কালো পা হয়ে যাচ্ছে সাদা। 'বেড়ালটার পায়ের রঙ আসলেই সাদা। এটা মিসেস ভেরা চ্যানেলের স্ফিঙ্কস। কালো রঙ লাগিয়ে দেয়া হয়েছে পায়ে।'

এতক্ষণে বুঝল মুসা, গতরাতে কেন এত নিশ্চিত ছিল কিশোর, ওটা মিসেস চ্যানেলের বেড়াল। 'খাইছে! এ-তো দেখছি ছদ্মবেশ!'

কাঁপা কাঁপা হাত বাড়াল জামান। বেড়ালটার একটা পা ধরে দেখল। চোখে অবিশ্বাস। 'ছদ্মবেশ! তাহলে রা-অরকনের আত্মা নয় ওটা! কিন্তু জ্যোতিষ যে বলল...'

'মিছে কথা বলেছে,' আবার গিয়ে আগের জায়গায় বসল কিশোর। 'মিসেস চ্যানেলের বেড়াল চুরি করে তার পায়ে রঙ করে তোমার ঘরে চালান দিয়েছিল। বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল, রা-অরকনের আত্মার সাক্ষাৎ পেয়েছ।'

'কিন্তু কেন?' চেঁচিয়ে উঠল জামান।

'হ্যাঁ, কেন?' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।

'জামানের বাবা আর ম্যানেজার জলিলকে বিশ্বাস করানর জন্যে। তাহলে

প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা ফেরত নেয়ার চেষ্টা করবেন তাঁরা,' জামানের দিকে তাকাল কিশোর। 'আমি শিওর, রা-অরকন তোমাদের পূর্বপুরুষ নন।'

'রা-অরকন আমাদের পূর্বপুরুষ!' কালো চোখের তারা জ্বলে উঠল জামানের। অনেক কষ্টে কান্না ঠেকিয়ে রেখেছে।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল কিশোর। 'ঠিক আছে, আগে মমিটা পেয়ে নিই। তারপর বোঝা যাবে সবই। আগে আমাদের জানা দরকার, কে চুরি করেছে রা-অরকনকে, এবং কেন?' জামানের দিকে তাকাল। 'জামান, গতরাতে মুসাকে যা যা বলেছ, আবার বল। মানে, জ্যোতিষ তোমাদের বাড়িতে যাওয়ার পর যা যা ঘটেছে। রবিন নোট লিখে রাখুক।'

বলতে শুরু করল জামান।

'সেরেছে!' মালীর কথা আসতেই চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'সারাক্ষণই জলিল থাকত প্রফেসরের বাড়ির আশেপাশে। সেই তোমাকে ধরেছিল! তাই তো বলি, এত সহজে ছাড়া পেলে কি করে!'

আমাকে তার হাত কামড়ে দিতে বলেছিল জলিল, দিয়েছি,' গর্বিত কণ্ঠে বলল জামান। 'আমাদের ম্যানেজার খুবই চালাক লোক!'

'জামান,' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'সমাধিকক্ষে অভিশাপ লেখা ছিল, জান তোমরা?'

'নিশ্চয়,' জবাব দিল লিবিয়ান ছেলেটা। 'জ্যোতিষ সবই বলেছে। ও বলেছে, দেশে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবে না রা-অরকনের আত্মা।'

'রহস্যজনক কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল প্রফেসরের বাড়িতে,' বলল কিশোর। 'আনুবিসের মূর্তি উপুড় হয়ে পড়েছিল। দেয়াল থেকে খসে পড়েছিল একটা মুখোশ। জলিলের কীর্তি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' হাসিতে ঝকঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল জামানের। 'জানালার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাতে একটা লম্বা শিক নিয়ে। দেয়ালে আর জানালার চৌকাঠের মাঝে আগেই একটা ছিদ্র করে রেখেছিল। সুযোগ বুঝে শিক ঢুকিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছে মূর্তিটা। শিক দিয়ে খোঁচা মেরে মুখোশও ফেলেছে। গেটের থামের খাঁজও সেই নষ্ট করেছে। এক সুযোগে জোরে বলটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই সরে গেছে চোখের আড়ালে। প্রফেসরকে আতঙ্কিত করে ফেলতে চেয়েছে সে, তাহলে মমিটা দিয়ে দেবে, এজন্যে।'

'যা ভেবেছি,' বলল কিশোর। 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন মমির অভিশাপ বাস্তবে কার্যকরী করা মোটেই কঠিন কিছু না। ওভারঅল পরা মালী রোজই বাগানে কাজ করে, বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছে, তাকে সন্দেহ করবে কে?'

'সবই বুঝলাম,' বলল মুসা। 'কিন্তু শেষতক মমিটা চুরি করল কে? জামান

কসম খাচ্ছে, ওরা চুরি করেনি। তাহলে? মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটাই বা চুরি করল কে? কে রেখে দিয়ে এসেছিল ওটাকে জামানের ঘরে? এগুলো খুব রহস্যজনক ব্যাপার। তাই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হ্যাঁ,' মুসার কথায় সায় দিল রবিন। 'আমার কাছেও তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া, মমিটা কথা বলে কি করে? ও সম্পর্কে জামান কিছু জানে না। কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে?'

'এবারে একটা প্রশ্ন,' প্রফেসারি ভঙ্গি কিশোরের। 'জামান, চোর দুটোকে সত্যিই দেখেছিলে? যারা রা-অরকনকে চুরি করেছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা নাড়ল জামান। 'গত সন্ধ্যায় জলিল বলল তার হাত ব্যথা করছে। আমাকে গিয়ে চোখ রাখতে বলল প্রফেসরের বাড়ির ওপর। একটা ঝোপে লুকিয়ে বসে আছি। বেড়ালটাও সঙ্গে আছে। ইচ্ছে করেই নিয়েছিলাম, তাতে সাহস পাচ্ছিলাম। একটা ট্রাক তখন দাঁড়িয়ে আছে চত্বরে। খানিক পরেই দুটো লোককে জাদুঘর থেকে বেরোতে দেখলাম। চাদরে পেঁচানো কি একটা ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে তুলল ট্রাকে। তখন বুঝতে পারিনি, মমিটা নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা চলে যাওয়ার পর জাদুঘরে ঢুকে দেখলাম, কফিনে নেই রা-অরকন।'

'আমরা প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে যাওয়ার পর ঘটেছিল ব্যাপারটা,' মন্তব্য করল রবিন।

'অপেক্ষা করতে থাকলাম,' বলে গেল জামান। ট্রাক নিয়ে চলে গেল চোর দুটো। খানিক পরেই হাজির হল মুসা। বেড়ালটা আমার পাশে নেই, খেয়াল করিনি প্রথমে। তারপর দেখলাম, ওটা মুসার হাতে। তাকেও চোরদের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলাম। রাগ দমন করতে পারিনি।...দুঃখিত, মুসা। না বুঝেই কাণ্ডটা করে ফেলেছিলাম।'

'তাতে বরং ভালই হয়েছে,' বলল মুসা। 'তোমার সঙ্গে পরিচয় হল। রহস্যটা সমাধান করা অনেকখানি সহজ হবে।'

'হুম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'পুরো ব্যাপারটা জটিল, তবে স্পষ্ট।'

'জটিল তো বটেই, একেবারে অস্পষ্ট,' ঘোষণা করল মুসা। 'ওই রহস্য শুধু মাথা খারাপ করতে বাকি রেখেছে আমার!'

'বেশ কিছু তথ্য পেয়ে গেছি,' বাস্তবে ফিরে এসেছে যেন কিশোর। 'এবার ওগুলো খাপে খাপে বসাতে পারলেই ব্যস! রহস্য আর রহস্য থাকবে না।'

নোট পড়ায় মন দিল রবিন। তথ্যগুলো খাপে খাপে বসানর চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করল, আরও বেশি জট পাকিয়ে গেল সবকিছু। সমাধান করতে পারল না। অসহায় ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে।

'প্রথমে,' বলল কিশোর। 'কফিনটা খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। রহস্য-

সামধানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাব তাহলে। স্টোরহাউসটা খুঁজে বের করে ওটার কাছে পিঠে লুকিয়ে থাকব। সন্ধ্যার পর এক সময় আসবে ওয়েব আর মেথু। কফিনটা ডেলিভারি দিতে নিয়ে যাবে। ওদেরকে অনুসরণ করব আমরা। কার কাছে নিয়ে যায়, দেখব। আসলে অপরাধীকে ধরে ফেলা কঠিন হবে না তখন।' সমর্থনের আশায় তিনজনের দিকেই একবার করে তাকাল সে। ওরা নীরব। কিশোরের কথা শেষ হয়নি বুঝে অপেক্ষা করছে। আবার বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'অপরাধীকে ধরতে পারলে মমি আর কফিনটা তো পেয়ে যাবই, সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।'

'চমৎকার!' বন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা মুসার কণ্ঠে। 'এত সহজ ব্যাপারটা মাথায়ই আসেনি।...কিন্তু স্টোর হাউসটা খুঁজে পাওয়া...মানে, খুঁজে পাব, কারণ চিহ্ন রেখে এসেছি—কিন্তু তাতে তো সময় লাগবে। দিন পনেরোর আগে হবে না। অথচ হাতে সময় আছে মাত্র আট-নয় ঘন্টা।'

'খুঁজতে যাচ্ছি না আমরা সেভাবে,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'লাভও হবে না গিয়ে খুঁজে। অন্য প্ল্যান করেছি, বলেছি না। একটা সুন্দর নাম দিয়েছি ব্যবস্থাটারঃ ভূত থেকে ভূতে।'

হাঁ হয়ে গেল অন্য তিনজন। কিছুই বুঝতে পারছে না।

'খুব সহজ একটা ব্যাপার,' হেসে বলল কিশোর। 'অথচ খুব কার্যকরী হবে আমার বিশ্বাস। খবর জোগাড়ের জন্যে শহরের প্রায় সব ক'জন ছেলেমেয়েকে লাগিয়ে দেয়া যায় এতে। কারই কোন কষ্ট হবে না, অথচ খবর ঠিকই এসে যাবে আমাদের হাতে। ছোট একটা পুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছি শুধু।'

কিশোরের কথা আরও হেঁয়ালিপূর্ণ মনে হল ওদের কাছে। চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে।

'সকালে,' বলল কিশোর। 'আমার পাঁচজন বন্ধুকে ফোন করেছি। বলেছি, লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীতে একটা স্টোর হাউসের দরজায় কিছু নীল প্রশ্নবোধক আঁকা আছে। কথাটা ওদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাতে বলেছি। ক'জন হল? পঁচিশ জন। ওই পঁচিশ জন আবার তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে জানাবে ফোন করে। তার মানে? একশো পঁচিশ। ওই একশো পঁচিশজন আবার তাদের পাঁচজন বন্ধুকে জানাবে। এভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়বে খবরটা। হাজারে হাজারে ছেলেমেয়ে একশো ডলার পুরস্কারের লোভে খুঁজতে থাকবে নীল প্রশ্নবোধক। কাজ কতখানি হালকা হয়ে গেল আমাদের? সময় কতখানি বাঁচল? এখন শুধু অপেক্ষার পালা। যে-কোন মুহূর্তে এসে যাবে খবর।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। ছুটে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধ জড়িয়ে ধরল বন্ধুকে। 'কসম খোদার, কিশোর পাশা! তুমি...তুমি সত্যিই একটা জিনিয়াস!'

ঠিক এই সময় বাজল টেলিফোন। আস্তে করে মুসার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে

রিসিভারের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। কানে ঠেকাল রিসিভার। 'হ্যাল্লো' বলেই একটা সুইচ টিপে দিল। জ্যান্ত হয়ে উঠল স্পীকার।

কিশোরের এক বন্ধু। জানাল, ভূত থেকে ভূতে ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। তবে বিকেলের আগে খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না, বলল ছেলেটা। তারপর কেটে দিল কানেকশন।

'খামোকা বসে না থেকে, প্রফেসর বেনজামিনের ওখান থেকে আরেকবার ঘুরে আসা যাক,' প্রস্তাব রাখল কিশোর।

'কিন্তু মেরিচাচী যেতে দেবেন বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'আসার সময় শুনে এলাম বোরিস আর রোভারের সঙ্গে কথা বলছেন। অনেক কাজ ইয়ার্ডে। আমরা এখান থেকে বেরোলেই আটকাবেন।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল কিশোর। 'তার চেয়ে বরং ফোন করি প্রফেসরকে। জামান, তোমাদের আর খামোকা বসে থাকার দরকার নেই। রবিন, ওকে এগিয়ে দিয়ে এস, প্লীজ।'

'যাচ্ছি,' উঠে পড়ল রবিন।

জামানও উঠল। জলিলকে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া দরকার, কিশোর পাশা। একটা ভুল ভাঙবে। তার ধারণা, আমেরিকান ছেলেরা সব পাজী। কাজকর্ম কিছু করে না। খালি অকাজের তালে থাকে, আর বাপের পয়সা ধ্বংস করে।'

'আমি আমেরিকান নই,' বলল কিশোর পাশা। 'বাঙালি। তবে আমেরিকান ছেলেরা সবাই খারাপ নয়। জলিলের সত্যিই এটা ভুল ধারণা। এই যে আমাদের রবিন, ও কি খারাপ?'

'হ্যাঁ, এটাই বোঝানো দরকার ওকে। আচ্ছা, চলি।' রবিনের পেছনে পেছনে দুই সুড়ঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল জামান।

'জামান,' পেছন থেকে ডাকল কিশোর। গতরাতে যা যা ঘটেছে, সব নিশ্চয় বলনি জলিলকে?'

'রা-অরকনকে খুঁজতে তোমার সাহায্য চেয়েছি, এটাই শুধু বলেছি,' ফিরে চেয়ে বলল জামান। 'বিশেষ কেয়ার করেনি। বলল, বাচ্চা-কাচ্চাদের এর মাঝে টেনে আনা বোকামি।'

'আর কিছু না বলে ভাল করেছ,' বলল কিশোর। 'কিছু বলবেও না। বড়দেরকে বেশি বিশ্বাস কোরো না। নিজেদেরকে সবজান্তা ভাবে, ছোটদের ব্যাপারে সব সময় বাগড়া দেয়। এবং অনেক সময়ই ঠিক কাজ করে না। তাছাড়া, গোয়েন্দার কাজে গোপনীয়তা একান্ত দরকার। কাউকে কিছু বলবে না, ঠিক আছে?'

মাথা কাত করল জামান। 'হ্যাঁ, আবার কখন দেখা হচ্ছে আমাদের?'

'আজ বিকেল ছ'টায় চলে এস,' বলল কিশোর। 'ততক্ষণে স্টোর হাউসের হদিস হয়ত পেয়ে যাব আমরা।'

'ঠিক আছে! ট্যাক্সি নিয়ে আসব। জলিল নাকি আজ খুব ব্যস্ত থাকবে, কয়েকজন কার্পেট ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলবে। সে আমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

রবিনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল জামান।

'খুব ভাল ছেলে,' বলল মুসা। 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বল তো, কিশোর? কি যেন ভাবিয়ে তুলেছে তোমাকে! রা-অরকনকে কে চুরি করেছে, জান নাকি?'

'সন্দেহ করছি একজনকে,' বলল কিশোর। 'মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটার খবর ছবিসহ অনেক ম্যাগাজিন আর পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, না?'

'হয়েছিল,' বলল মুসা। 'কয়েকটা ছবি দেখিয়েছেনও আমাকে মিসেস চ্যানেল।'

'ধর, ওরকম একটা বেড়াল দরকার কারও। স্ফিঙ্কসের কথা সহজেই জানতে পারবে সে। বেড়ালটা খুব ভদ্র, ওটাকে যে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারে। তারপর পায়ে কালো রঙ করে নেয়াটা কিছুই না। এখন কথা হচ্ছে, রা-অরকনকে কার এত দরকার হল? জামানের ঘরে বেড়ালটাকে ঢুকিয়ে দেয়া কার পক্ষে সহজ? সমাধিকক্ষে লেখা অভিশাপের কথা কে বেশি জানে? এবং কে প্রফেসর বেনজামিনের কাছ থেকে মমিটা নিয়ে যেতে চায়?'

এক মুহূর্ত ভাবল মুসা। 'মালী, মানে, জলিল। জামানদের ম্যানেজার।'

'ঠিক,' কিশোর বলল। 'মমিটাকে রাখার জন্যে কফিনটাও তারই বেশি দরকার। তাই না?'

'নিশ্চয়ই।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিন্তু জামান কসম খেয়ে বলেছে, জলিল এ-ব্যাপারে কিছু জানে না।'

'জামানের তাই ধারণা। কিন্তু বড়রা সব সময় সব কথা ছোটদেরকে বলে না, এটা তো ভাল করেই জান। আরও একটা কারণ হতে পারে, গোপন কোন পরিকল্পনা থাকতে পারে জলিলের। হয়ত মমিটা চুরি করে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। পরে জামানের বাবাকে বলবে, অনেক টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। টাকাটা সে নিজে মেরে দেবে। মমিটা ফেরত পাওয়ার জন্যে যে-কোন মূল্য দিতে রাজি জামানের বাবা। সুযোগটা ছাড়বে কেন ম্যানেজার?'

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ঠিক ধরেছ! সে তাই করবে! আরবী জানে জলিল। প্রাচীন আরবী জানাও তার পক্ষে সহজ। দরজার বাইরে লুকিয়ে থেকে ভেন্ট্রিলোকুইজম ব্যবহার করেছে, মনে হয়েছে মমিটাই কথা বলেছে!'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিন্তু, আগে প্রমাণ দরকার। তার আগে জামানকে কিছু বলা যাবে না। রেগে চার্জ করে বসতে পারে জলিলকে। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে

ম্যানেজার। তখন তাকে বাগে পাওয়া খুব কঠিন হবে।'

'ঠিক,' একমত হল মুসা। 'কিশোর, এখন কি করব? সারাটা দিন পড়ে আছে। স্টোরহাউসের খবর কখন আসবে কে জানে! মেরিচাচীর সামনেও পড়তে চাই না। আজ ইয়ার্ডের কাজ করতে মোটেই ভাল্লাগবে না।'

'এবং সেজন্যেই এখন বেরনো যাবে না এখান থেকে,' টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'প্রফেসরকে পাওয়া যায় কিনা দেখি। হুপারের খোঁজ নেয়া দরকার।'

পাওয়া গেল প্রফেসরকে। 'হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে হুপার,' জানালেন তিনি। 'প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিল বেচারা। অদ্ভুত এক দৃশ্য নাকি দেখেছে গতরাতে। ঝোপ থেকে নাকি বেরিয়ে এসেছিল শেয়াল-দেবতা আনুবিস। দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেছিল। আতঙ্কেই বেহুঁশ হয়ে গেল হুপার। তার ধারণা, তারপর রা-অরকনকে চুরি করে নিয়ে গেছে আনুবিস।'

চাওয়া-চাওয়ি করল কিশোর আর মুসা।

'কিন্তু আমরা জানি, ওয়েব আর মেথু চুরি করেছে মমিটা।' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'প্রফেসর,' ফোনে বলল কিশোর। 'আমার মনে হয়, রবারের মুখোশ পরে এসেছিল কেউ। ভয় দেখিয়েছে হুপারকে। আনুবিসের মুখোশ পাওয়া যায় বাজারে। অবিকল ওরকম না হলেও শেয়ালের মুখ যে-কোন খেলনার দোকানে পাওয়া যায়।'

'তা ঠিক,' স্পীকারে শোনা গেল প্রফেসরের কণ্ঠ। 'আমারও তাই ধারণা। তো, কি মনে হয়? মমিটা আবার ফিরে পাওয়া যাবে? রহস্যটা কি, কিছু বুঝতে পেরেছ? জলিল ব্যাটাকে সন্দেহ-টন্দেহ হয়?'

'কিছু কিছু ব্যাপার আন্দাজ করেছি, স্যার, কিন্তু কোন প্রমাণ পাইনি এখনও। আর, আজ বিকেলে কফিনটা উদ্ধার করতে যাব, আশা করছি। তেমন কিছু জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জানাব। রাখি এখন।' রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। ট্রেলারের ছাতের দিকে চেয়ে গভীর ভাবনায় ডুব গেল।

অপেক্ষা করছে মুসা। এক সময় উসখুস করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল, 'কি ভাবছ?'

'ভাবছি,' মুখ নামাল কিশোর। 'প্রফেসর বেনজামিন বলেছেন অভিনেতা ছিল হুপার। থিয়েটারে অভিনয় করেছে।'

'তাতে কি?'

'বেহুঁশের অভিনয় সহজেই করতে পারে একজন অভিনেতা,' বলল কিশোর। 'রঙ্গ-নাটকে ভেন্ট্রিলোকুইস্ট-এর কাজ করেছে কিনা, তাই বা কে জানে?'

'যদি করে থাকে?'

'অনুমান কর।'

'হুপারকে অপরাধী ভাবছ? ও একা? নাকি জলিলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে? নাকি অন্য কারও সঙ্গে? আসলে কি ভাবছ তুমি, কিশোর?'

'সময়েই সব জানা যাবে,' কেমন রহস্যময় শোনাল কিশোরের কথা।

এরপর সারাটা দিনে রেগে গুম হয়ে থাকল মুসা। আর একটা কথা বলল না কিশোর। তার কোন কথার জবাবও দিল না। একমনে কি ভাবল সারাক্ষণ।

চোদ্দ

বিকেল। ইয়ার্ডের পিক-আপটা খারাপ রাস্তা ধরে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলীর দিকে। স্টিয়ারিং ধরেছে রোভার। মেরিচাচীকে অনেক অনুরোধ করে অনুমতি আদায় করেছে কিশোর।

ছ'টার অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে জামান। এখন বসে আছে রোভার আর কিশোরের পাশে। ট্রাকের পেছনে ভাঁজ করে রাখা ক্যানভাসের ওপর বসেছে রবিন আর মুসা। সারাক্ষণ তর্ক করছে ওরা, কে অপরাধী তা নিয়ে। একবার বলছে জলিল, একবার হুপার। দু'বার এক মত হয়েছে, দু'বারই মত পাল্টেছে আবার। এখন আবার শুরু করে দিয়েছে তর্ক। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছে না, কাকে অপরাধী বলবে। ম্যানেজার আর খানসামা, দু'জনকেই অপরাধী মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

শহরতলীর একটা প্রান্তে পৌঁছে থেমে গেল ট্রাক। পাশ দিয়ে বাইরে উঁকি দিল মুসা আর রবিন। পুরানো একটা থিয়েটার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক সময় বড়সড় রঙচঙে সাইনবোর্ড ছিল, এখনও রয়েছে; তবে আগের সেই জৌলুস নেই। 'থিয়েটার' শব্দটা কোনমতে পড়া যায় সদর দরজায় একটা নোটিশঃ বন্ধ। ঢোকার চেষ্টা করবেন না কেউ।

জামান আর কিশোরকে বেরিয়ে আসতে দেখে লাফ দিয়ে নামল মুসা আর রবিন।

'বিল্ডিংটা চিনতে পারছ?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'সামনেটা দেখিনি গতরাতে,' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ। 'তবে উঁচু যেন একটু বেশিই মনে হচ্ছে!'

'এই বিল্ডিংটা নয়!' মাথা নাড়ল জামান।

'কিন্তু আমাদের "ভূত" এই ঠিকানাই তো দিয়েছে,' হাতের কাগজের টুকরোটা দেখছে কিশোর। টেলিফোনে ঠিকানা জানিয়েছিল একটা ছেলে, লিখে নিয়েছে। 'এক আট তিন নয় দুই, ক্যামেলট স্ট্রীট।...চল, পেছন দিকটা দেখি। দরজায় প্রশ্নবোধক থাকলে আর কোন সন্দেহ নেই।'

বাড়িটার পেছনে চলে এল ওরা। বড় একটা দরজা, ভেতরে নিশ্চয় স্টোর রুম। দরজায় নীল রঙে আঁকা কয়েকটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

'ওই যে, সেকেণ্ড, তোমার চিহ্ন,' আঙুল তুলে দেখাল কিশোর। 'জায়গা এটাই।'

'সন্দেহ হচ্ছে!' ভুরু কুঁচকে আছে মুসা। 'ওই চিহ্ন আমি আঁকিনি! জামান, তোমার কি মনে হয়?'

'আমারও সন্দেহ হচ্ছে,' বলল জামান। 'তবে অন্ধকার ছিল তখন। ভালমত দেখিনি হয়ত এই বাড়িই।'

'তাছাড়া উত্তেজিত ছিলে তোমরা, তাড়াহুড়ো ছিল,' বলল কিশোর। 'ভালমত দেখতে পাবার কথাও নয়। এই যে দরজাটা, এটা দিয়ে সহজেই ট্রাক ঢুকতে পারবে। তলায় কয়েক ইঞ্চি ফাঁকও রয়েছে। চল, উঁকি দিয়ে দেখি ভেতরে। কফিনটা চোখে পড়লেই সব সন্দেহের অবসান হয়ে যাবে।'

দরজার কাছে এগিয়ে গেল ওরা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মুসা। মাথা নুইয়ে উঁকি দিল নিচ দিয়ে। ঠিক এই সময় শব্দ তুলে উঠে গেল দরজা। দেখা গেল তিনটে মুখ। হাসিতে উজ্জ্বল।

'এই যে, কিশোর হোমস আর তার চেলাচামুণ্ডারা এসে গেছেন,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে টেরিয়ার ডয়েলের।

'সূত্র খুঁজছ, শার্লক হোমস?' বলল টেরিয়ারের এক সঙ্গী। দাঁত বের করে হাসছে।

'প্রশ্নবোধক চিহ্ন খুঁজছ তো?' বলল তৃতীয় ছেলেটা। 'প্রচুর দেখতে পাবে। শহরতলীর যেখানে খুঁজবে সেখানেই পাবে। প্রচুর চিহ্ন রয়েছে।'

'আমার মনে হয়, আর অপেক্ষা করে লাভ নেই,' সঙ্গীদেরকে বলল টেরিয়ার। 'আমাদের যাওয়াই উচিত। মিস্টার গর্দভ হোমস আর তাঁর ছাগলা-চেলারা দায়িত্ব নিয়েছে। পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারবে শিগগিরই।'

মুঠো পাকিয়ে এগোতে গেল মুসা, খপ করে তার হাত চেপে ধরল কিশোর। 'ছেড়ে দাও। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে নাকি? গুটকি আরও গুটকি হয়ে ফিরে এসেছে। গন্ধে কাক ভিড় জমাবে। ওয়াক, থুহ!'

জ্বলে উঠল টেরিয়ারের চোখ। পা বাড়াতে গিয়েও মুসার পেশীবহুল বাহুর দিকে চেয়ে থেমে গেল। ফিরে তাকাল দুই সঙ্গীর দিকে, ওদের সাহায্য পাবে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। কিন্তু নিরাশ হল। রাস্তার পাশে পার্ক করে রাখা নীল স্পোর্টস কারটার দিকে তাকাচ্ছে ওরা ঘনঘন। ছুটে গিয়ে ওতে উঠে পড়ার তালে আছে। মুসা আমানের সঙ্গে লাগতে রাজি নয় কেউই।

'তৈরি থেক, শার্লক হোমসেরা,' কর্কশ গলায় বলল টেরিয়ার। 'আবার দেখা করব আমি তোমাদের সঙ্গে।' ছুটে বেরিয়ে গেল সে। পেছনে ছুটল তার দুই সঙ্গী।

গাড়ি নিয়ে চলে গেল টেরিয়ার আর তার সঙ্গীরা।

'প্রচুর চিহ্ন রয়েছে,' টেরিয়ারের সঙ্গীর এই কথাটার মানে প্রথম বুঝতে পারল রবিন। আঙুল তুলে পাশের বাড়ির একটা দরজা দেখিয়ে বলল, 'দেখ দেখ, নীল প্রশ্নবোধক! তার মানে বন্ধ দরজা এদিকে যে ক'টা পেয়েছে, সবগুলোতে চিহ্ন এঁকেছে ওরা!'

রাগে লাল হয়ে উঠেছে কিশোরের মুখ। 'শুটকি আর তার চেলাদের কাজ! নিশ্চয় কোন একটা ছেলে শুটকির কাছেও ফোন করে বলেছিল আমরা কি খুঁজছি। ব্যস, এখানে এসে তৈরি হয়ে বসেছিল টেরি। তার কোন একটা চেলা ফোনে আমাদেরকে ঠিকানা দিয়েছে এ-বাড়িটার।'

'খুব একখান গোল দিয়ে গেল আমাদেরকে, হারামজাদারা!' গোঁ গোঁ করে উঠল মুসা। 'খামোকা আটকেছ আমাকে। হাতের ঝাল মিটিয়ে নিতাম! পিটিয়ে তক্তা করে ফেলা উচিত ব্যাটাকে...!'

পরিস্থিতি খুব জটিল করে দিয়ে গেছে টেরিয়ার, এতে কোন সন্দেহ নেই। নীল প্রশ্নবোধকের আর কোন মূল্য নেই এ-মুহূর্তে। কোন বাড়িটায় যে রয়েছে কফিন, চিহ্ন দেখে বোঝার আর কোন উপায় নেই।

'কি করব আমরা এখন?' হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। হেডকোয়ার্টারে ফিরে যাব?'

'নিশ্চয় না!' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'প্রথমে দেখব, কতগুলো দরজায় প্রশ্নবোধক এঁকেছে শুটকি আর চেলারা। তারপর কি করা যায়, পরে বিবেচনা করব। তবে, ভূত-থেকে-ভূতে ব্যবস্থার ভাল দিক বেশি হলেও দুর্বলতা কিছু রয়েছে। এটা নিয়ে ভাবতে হবে, পরে।'

ছড়িয়ে পড়ে খুঁজতে শুরু করল ওরা। বেশ কয়েকটা ব্লকে পাওয়া গেল প্রশ্নবোধক। হতাশ হয়ে ট্রাকের কাছে ফিরে এল ওরা, এরপর কি করবে তা নিয়ে ভাবতে বসল।

'গাড়ি নিয়ে ঘুরব,' বলল কিশোর। 'হয়ত জামান কিংবা মুসার চোখে পরিচিত কিছু পড়েও যেতে পারে। এতখানি এসে হাল ছেড়ে দেব না কিছুতেই। এটাই আমাদের শেষ সুযোগ। ওয়েব আর মেথু কফিনটা একবার এ-এলাকা থেকে বের করে নিয়ে গেল, মমি রহস্য সমাধানের উপায় আর থাকবে না।'

ভারি মন নিয়ে ট্রাকে চড়ল ওরা। ক্যামেলট স্ট্রীট ধরে খুব ধীরে এগোল রোভার।

'মার খেয়ে গেলাম আমরা,' বিষণ্ণ মুসা। 'সেটা স্বীকার করে নিলেই তো পারি?'

'পাগল হয়েছ?' গম্ভীর কিশোর। 'তাহলে শুটকি আমাদেরকে আর টিকতে দেবে না রকি বীচে। যেখানে যাব, পেছন থেকে হাততালি দিয়ে হাসবে...ওইযে,

একটা গীর্জা। গতরাতে ওটা চোখে পড়েছিল?'

'নাহ্!' মাথা নাড়ল মুসা। 'তাছাড়া যেটা দিয়ে চলেছি, রাস্তাও এটা নয়। আরও অনেক সরু ছিল, একেবারে এঁদো গলি!'

'অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে হবে তাহলে। রোভার, ডানে ঘুরুন, প্লীজ।'

'হোকে (ও-কে),' বলল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। শাঁই করে ডানে মোড় ঘোরাল ট্রাক। সরু একটা গলি পথে এসে পড়ল।

বড়জোর তিনটা ব্লক পেরিয়েছে ট্রাক, হঠাৎ কিশোরের আস্তিন খামচে ধরল মুসা। 'ওই যে, আইসক্রীমের দোকানটা, মনে হচ্ছে গত রাতে ওটার পাশ দিয়ে ছুটেছিলাম।' আঙুল তুলে দেখাল সে কোন-আইসক্রীম চেহারার ছোট বিল্ডিংটা।

'রোভার, থামুন,' বলল কিশোর।

থেমে গেল ট্রাক। দ্রুত নেমে পড়ল চার কিশোর। আইসক্রীম স্ট্যাণ্ডটার সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

'গতরাতে এটা দেখেছিলে? মনে পড়ে?' জামানকে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ,' ওপরে নিচে মাথা দোলাল জামান। 'আমি ভেবেছিলাম, মন্দির। অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে চেহারা একেবারে আলাদা।'

রবিন হাসল, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেক অদ্ভুত জিনিসই দেখতে পাবে। কমলা আকৃতির কোন বিল্ডিং দেখলে, বুঝে নেবে ওখানে কমলার রস পাওয়া যায়। এই যে মন্দিরের চেহারা ওরকম দেখলে, বুঝতে হবে আইসক্রীম। আরও অনেক খাবার আছে, যেগুলোর আকৃতির সঙ্গে মিল রেখে তৈরি হয় বিল্ডিংগুলো। বিজ্ঞাপনও হয়, লোকের বুঝতেও সুবিধে হয়, ওটা কিসের দোকান।'

আরও কিছু কথা জানার কৌতূহল হচ্ছিল জামানের, কিন্তু সময় নেই এখন।

আইসক্রীমের দোকানটা শুধু চিনল জামান আর মুসা, আশপাশের আর কিছু চিনতে পারল না। অন্ধকারে, উত্তেজনায় খেয়াল করেনি।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। 'রবিন, তুমি আর জামান এখানে থাক। ওয়াকি-টকি তৈরি রাখ। দরকার হলেই যাতে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পার। মুসা, এই গলি, আর আশপাশের সব ক'টা কানা গলি খোঁজ। চিহ্ন দেখতে পেলেই রেডিওতে জানাবে। আমি যাচ্ছি উল্টোদিকে। খুঁজব। পেয়েও যেতে পারি ঠিক বাড়িটা। পুরো শহরতলীতে চিহ্ন আঁকতে পারেনি শুটকি, সেটা সম্ভবও নয়।'

'ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে,' মাথা কাত করল মুসা।

'রোভার এখানেই ট্রাক রাখবে। এটাকেই ঘাঁটি ধরে নিতে হবে আমাদের। যে-ই ফিরে আসি, এখানে চলে আসব। সব সময় যোগাযোগ রাখব ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ঠিক আছে?'

সায় জানাল সবাই।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিগগিরই অন্ধকার নামবে। দুই গলি ধরে দু'দিকে রওনা

হয়ে গেল মুসা আর কিশোর। ট্রাকের কাছে দাঁড়িয়ে রইল রবিন আর জামান।

'কফিনটা যদি খুঁজে না পায় ওরা?' বলল জামান। 'তাহলে মমিটাও পাবে না। চিরদিনের জন্যে হারাব আমরা রা-অরকনকে। কি করে এই দুঃসংবাদ জানাব গিয়ে বাবাকে? না আমি বলতে পারব, না জলিল!'

কিশোরের কথা এখনও বিশ্বাস হয়নি জামানের, এখনও বিশ্বাস করছে রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। ব্যাপারটা নিয়ে চাপাচাপি করল না রবিন। জিজ্ঞেস করল, 'জলিল কোথায়?'

'বাসায়ই বোধহয়,' জবাব দিল জামান। বলল, 'ব্যবসার কাজে নাকি ব্যস্ত থাকবে আজ। কয়েকজন কার্পেট-ব্যবসায়ী আসবে। জরুরি আলোচনা আছে তাদের সঙ্গে।'

কিসের কার্পেট-ব্যবসায়ী? দুই চোর মেথু আর ওয়েবের সঙ্গে দেখা করবে আসলে জলিল, ধরেই নিল রবিন। এমনিতেই বিষণ্ন হয়ে আছে জামান। কথাটা জানিয়ে তাকে আরও দুঃখ দিতে ইচ্ছে হল না তার।

রবিন আর জামান কথা বলছে, ততক্ষণে কয়েকটা ব্লক দেখা হয়ে গেছে কিশোর আর মুসার। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ওয়াকি-টকির মাধ্যমে। ব্যর্থতার কথা একটু পর পরই জানাচ্ছে একে অন্যকে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে। চকের দাগ দেখাই যাবে না আর এখন।

'পারলে আরও একটা গলি দেখ, সেকেণ্ড,' হতাশ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তারপর ফিরে এস ট্রাকের কাছে। আলোচনা করে ঠিক করব, এরপর কি করা যায়।'

'বুঝেছি,' খুদে স্পীকারে জবাব এল মুসার। 'আউট।'

পরের গলিটা ধরে এগিয়ে চলল কিশোর। এর আগে যে কয়েকটা গলি দেখেছে, ওটাও ওগুলোর চেয়ে আলাদা নয়। একই রকম দেখতে। ওই রকমই পুরানো ধাঁচের বাড়ি, দোকানপাট—বেশির ভাগই বন্ধ। ব্যবসা নিশ্চয় এদিকে ভাল জমে না। তাই সন্ধ্যার আগেই দোকান বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি চলে গেছে দোকানদাররা।

গলির প্রায় শেষ মাথায় বড় একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল কিশোর। বড় একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্রাক। পুরানো। নীল শরীর, জায়গায় জায়গায় চটে গেছে রঙ। দরজাটা তুলে দিয়েছে একজন লোক। কাজেই ওটাতে প্রশ্নবোধক আঁকা আছে কিনা, জানার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ নেই। ঘুরতে যাবে ঠিক এই সময় কানে এল কথা।

'মেথু, ট্রাক ঢোকাও ভেতরে,' বলল একজন।

'ঢোকাচ্ছি।' ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটার গলা শোনা গেল, 'দরজার কাছ থেকে সর। এই ওয়েব···হ্যাঁ, সর, আরও।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার কিশোর। মেথু! ওয়েব! ট্রাক। বড় দরজা, বড় বাড়ি। আর কোন সন্দেহ নেই। এবাড়িটাই খুঁজছে ওরা।

পনেরো

ছুটে ট্রাকের পাশে চলে এল কিশোর। ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ট্রাক। হেড লাইট জ্বালায়নি। গাঢ় অন্ধকার।

বাঁ পাশে রয়েছে ওয়েব। ট্রাকের ডান থেকে এগোল কিশোর। দরজার ফ্রেম আর ট্রাকের বডির মাঝে মাত্র দু'ফুট ফাঁক। ওই ফাঁক দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

পুরো শরীরটা ভেতরে ঢুকে গেল ট্রাকের, থেমে দাঁড়াল। কিশোর দাঁড়িয়ে পড়ল ওটার পাশে, অন্ধকারে।

'দরজা নামিয়ে দিচ্ছি আমি,' শোনা গেল ওয়েবের গলা! 'তারপর হেডলাইট জ্বালাবে। নইলে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাব না।'

ট্রাকের পাশে উবু হয়ে আছে কিশোর। দ্রুত চিন্তা চলছে মাথায়। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। আলো জ্বলে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারবে না। তাহলে চোরদের চোখে পড়ে যাবে। এর আগেই লুকিয়ে পড়তে হবে কোথাও। কোথায়?

বেশি ভাবনা চিন্তার সময় নেই। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে! গড়িয়ে চলে এল ট্রাকের তলায়। দরজা নামানর প্রচণ্ড শব্দে ঢাকা পড়ে গেল তার গড়ানর মৃদু আওয়াজ। মুহূর্ত পরেই জ্বলে উঠল হেডলাইট। আলোকিত হয়ে উঠল ঘরের অনেকখানি। দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে কিশোরের। তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবে পুরানো আমলের গাড়িটার চাকা আর কফিনের ওপরের ক্যানভাস ঠিকই চোখে পড়ল।

ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছে কিশোর। সাহায্য দরকার, সঙ্গে রেডিও আছে, কিন্তু সাহায্য চাইবার উপায় নেই। কথা বললেই শুনে ফেলবে চোরেরা।

চুপচাপ পড়ে আছে কিশোর। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন বুকের ভেতর। ভয় হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের শব্দ না আবার শুনে ফেলে দুই চোর।

ট্রাক থেকে নেমে এল মেথু। মাত্র ছয় ফুট দূরে দুই জোড়া পা দেখতে পাচ্ছে কিশোর।

'মক্কেল ব্যাটা রাজি হল তাহলে!' হাসল মেথু। 'জানতাম, হবে। কফিনটা পাওয়ার জন্যে যা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে! কিন্তু এই বাক্স দিয়ে কি করবে ব্যাটা?'

'ওই ব্যাটাই জানে!' বলল ওয়েব। 'জান তো, কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে? হলিউডের বাইরে। একটা খালি গ্যারেজ দেখিয়ে দিয়েছে। ওর ভেতরে ঢুকে যেতে হবে ট্রাক নিয়ে।'

'তাই নাকি?'

'আরও আছে। ওর ধারণা, আমাদেরকে অনুসরণ করা হবে? ভয় পাচ্ছে। খুব সতর্ক থাকতে বলেছে আমাদেরকে। যদি দেখে অনুসরণ করা হচ্ছে, তাহলে যেন মাল ডেলিভারি না দিই, এ কথাও বলে দিয়েছে।'

'ব্যাটার মাথা খারাপ!' তীক্ষ্ণ শোনাল মেথুর গলা। 'কে অনুসরণ করতে আসবে আমাদের? কেউ জানেই না কিছু। আমরা ডেলিভারি দেবই। টাকা ভীষণ দরকার।'

'আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। যদি দেখি অনুসরণ করা হচ্ছে না, তাহলে মাঝপথে থেমে ফোন করে তাকে জানাতে হবে। দরকার মনে করলে, ডেলিভারির ঠিকানা বদল করবে সে।'

'গরু পেয়েছে আমাদেরকে! এত বদলা-বদলি করতে পারব না। তাহলে আরও বেশি টাকা লাগবে।'

'আসল কথাটা তো শোনাইনি এখনও। ডেলিভারি দেয়ার পর আবার মালদুটো নিয়ে আসতে হবে ওর ওখান থেকে। নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যাতে কোনরকম চিহ্ন না থাকে। আর সেজন্যে সে আরও এক হাজার ডলার দেবে আমাদেরকে।'

'আরও এক হা—জা—র! তাহলে জিনিস দুটো চাইছে কেন? পুড়িয়েই যদি ফেলবে?'

'জানি না। হয়ত কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছে। নষ্ট করে ফেলতে চাইছে এখন। ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকতে পারে। যা খুশি করুকগে আমাদের টাকা পাওয়া নিয়ে কথা। পেলেই হল। এস, তুলে নিই এটা ট্রাকে।'

কফিনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দুই জোড়া পা। আলো পড়েছে ওটার ওপর, দেখতে পাচ্ছে কিশোর। টান দিয়ে ক্যানভাস তুলে ফেলল একজন। আরেকজন ঝুঁকল কফিনটার ওপর।

'দাঁড়াও,' বলে উঠল ওয়েব। 'খুলে আগে দেখে নিই। ব্যাটা এত পাগল কেন! নিশ্চয় মূল্যবান কিছু আছে এর ভেতর!'

ঢাকনা তুলে ফেলল দু'জনে মিলে। বাক্সের ভেতরের চারধার আর তলায় হাত চালিয়ে দেখল।

'না,' বলল ওয়েব। 'কিচ্ছু নেই। ধর, ট্রাকে তুলে ফেলি।'

আবার জায়গামত ঢাকনাটা বসাল ওরা। এক প্রান্ত থেকে ঠেলে নিয়ে এল ট্রাকের পেছনে। তুলতে গিয়ে দেখল, দরজা আর ট্রাকের পেছনে খুব একটা ফাঁক নেই। জায়গা হচ্ছে না, তাই তোলা যাচ্ছে না কফিনটা।

'আরও সামনে বাড়াতে হবে ট্রাক,' বলল ওয়েব। 'অল্প একটু বাড়ালেই চলবে।'

'তুমি বাড়াও। আমি পানি খেয়ে আসি,' বলে একদিকে চলে গেল মেথু।

ড্রাইভিং সিটে বসল ওয়েব। গর্জে উঠল ইঞ্জিন। কয়েক ফুট সামনে বাড়াল ট্রাক। কিশোরের ওপর থেকে সরে চলে গেছে।

বেকায়দায় পড়ে গেল কিশোর। রেডিওতে বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় নেই। হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে কোণের কোন একটা জিনিসের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাহলে চলে যাবে ট্রাকটা। ওটাকে অনুসরণ করার কোন উপায় থাকবে না। ট্রাকের ভেতরে উঠে বসে থাকতে পারে। কিন্তু কফিনটা তোলার সময়ই তাকে দেখে ফেলবে চোরেরা।

ভাবনার ঝড় বইছে কিশোরের মাথায়। কোন উপায় দেখছে না। লুকিয়ে থেকে ট্রাকটাকে অনুসরণ করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে, অথচ চোরদের চোখে পড়া চলবে না, একই সঙ্গে সবগুলো করা অসম্ভব মনে হচ্ছে তার কাছে। অথচ যেভাবেই হোক করতেই হবে।

তারপর, হঠাৎই বুঝে গেল কিশোর, কি করতে হবে।

এখনও ফেরেনি মেথু। ড্রাইভিং সিটেই বসে আছে ওয়েব। হামাগুড়ি দিয়ে কফিনটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। আস্তে করে ঢাকনার একদিক ফাঁক করে বান মাছের মত পিছলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আবার নামিয়ে দিল ঢাকনা। তবে, আগে ফাঁকের মধ্যে একটা পেন্সিল ঢুকিয়ে নিল, মুসা যা করেছিল। বাতাস চলাচল দরকার।

আর কিছুই করার নেই। এখন শুধু চুপচাপ শুয়ে থাকা। দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল কিশোর।

ট্রাকের কাছে ফিরে এসেছে মুসা। চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন আর জামানের সঙ্গে। সবাই উদ্বিগ্ন। কিশোরের কাছ থেকে শেষ নির্দেশ আসার পর অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। আর কোন সাড়া নেই। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করছে রবিন আর মুসা। কিন্তু একেবারে নীরব গোয়েন্দাপ্রধান। হল কি? কোন বিপদে পড়ল?

তারপর হঠাৎ করেই কথা বলে উঠল স্পীকার। 'ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! মুসা, শুনতে পাচ্ছ?'

'সেকেণ্ড বলছি। শুনতে পাচ্ছি, ফার্স্ট। কি হয়েছে?'

'যে ট্রাকটাকে খুঁজছ, ওটা এখন হলিউডের দিকে ছুটছে।' ভেসে এল কিশোরের গলা। 'নীল, রঙ-চটা, দুই টনী ট্রাক। লাইসেন্স নাম্বারঃ পি এক্স সাতশো পঁচিশ। এখন সম্ভবত পেইন্টার স্ট্রীট ধরে পশ্চিমে ছুটেছে। শুনতে পেয়েছ?'

'পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। ওরা এখন পেইন্টার স্ট্রীটেই দাঁড়িয়ে আছে। কিশোরের জোরাল গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, মাত্র কয়েকটা ব্লক দূরে আছে সে।

'এখুনি পিছু নিচ্ছি ওটার, ফার্স্ট,' বলল মুসা। 'তুমি কোথায়?'

'গতরাতে তোমরা যেখানে ছিলে,' জবাব এল।

'কফিনের ভেতরে?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'এবং ডালাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা,' বলল কিশোর। 'বেরোতে পারব না। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন উপায় নেই, রেডিও ছাড়া। ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করবে না কিছুতেই। তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার শিগগিরই।'

'পেছনে লেগে থাকব,' বলেই ঘুরল মুসা। দ্রুত নির্দেশ দিল সঙ্গীদেরকে।

তাড়াহুড়ো করে ট্রাকে উঠে পড়ল তিনজনে। কি করতে হবে, রোভারকে বলল মুসা।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই বনবন স্টিয়ারিং ঘোরাল বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। উল্টো দিকে নাক ঘুরে গেল ট্রাকের। তীব্র গতিতে পেরিয়ে এল কয়েকটা ব্লক। দেখা পেল নীল ট্রাকের। মিলে গেল লাইসেন্স নাম্বার। সন্দেহ নেই, ওটাতেই আছে কিশোর পাশা। আধ ব্লক মত পেছনে সরে এল রোভার। ওই দূরত্ব রেখেই অনুসরণ করে চলল। এখানে রাস্তায় আলো আছে ভালই, নীল ট্রাকটাকে চোখে চোখে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

'তোমার আধ ব্লক পেছনে রয়েছি, ফার্স্ট,' ওয়াকি-টকিতে জানাল মুসা। 'ঠিক কোথায় যাচ্ছে ট্রাকটা, জান?'

'জানি না,' জবাব এল কিশোরের। 'তবে হলিউডের বাইরে কোন একটা গ্যারেজে। কোন ধরনের গ্যারেজ তা-ও বলতে পারব না।'

'সিনেমা দেখছি যেন!' উত্তেজিত হয়ে উঠছে জামান। 'তবে আরও বেশি রোমাঞ্চকর! কিন্তু কিশোরের কি হবে? যদি হারিয়ে ফেলি আমরা ট্রাকটাকে?'

ট্রাকটাকে চোখের আড়াল করা যাবে না কিছুতেই,' বিড়বিড় করল রবিন।

বেশ কয়েক মাইল পেরিয়ে এল ওরা। নীল ট্রাকটা এখনও আধ ব্লক দূরে। হঠাৎ গতি বেড়ে গেল ওটার? কোন রকম সন্দেহ হয়েছে? অনুসরণ করা হচ্ছে, বুঝতে পেরেছে?

অনেক দেরিতে বুঝল ওরা কারণটা। সামনে রেল লাইন। ট্রেন আসছে। ব্যারিয়ার পড়তে শুরু করেছে রেলগেটে। শেষ মুহূর্তে বেরিয়ে চলে গেল নীল ট্রাক। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যারিয়ার ওপরে থাকতে থাকতে পৌঁছতে পারল না রোভার। আটকা পড়ে গেল এপাশে।

'ফার্স্ট!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমরা আটকা পড়ে গেছি। মালগাড়ি। মাইলখানেকের কম হবে না লম্বা! চলেছেও খুব ধীরে ধীরে। তোমাদেরকে বোধহয় হারালাম। শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি!' শোনা গেল কিশোরের গলা। 'সেকেণ্ড!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে। 'মোড় নিয়েছে ট্রাক! দিক-টিক কিচ্ছু বলতে পারব না! কোন রাস্তা দিয়ে যে

চলেছি…' মৃদু হতে হতে মিলিয়ে গেল কথা।

'ফার্স্ট।' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'তোমার গলা শুনতে পাচ্ছি না! মনে হয় রেঞ্জ বেড়ে গেছে! কিশোর?'

কোন জবাব নেই।

আরেকবার চেষ্টা করল মুসা। জবাব পেল না। দুটো ট্রাকের দূরত্ব অনেক বেড়ে গেছে, বুঝতে পারল। ওয়াকি-টকির রেঞ্জের মধ্যে নেই কিশোর।

ষোলো

উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করল কিশোর কয়েক মিনিট। স্পীকারে আসছে না মুসার গলা। নিশ্চয় রেঞ্জের বাইরে পড়ে গেছে। কল্পনা করতে পারছে ও, ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসছে রোভার। চারজোড়া চোখ উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজছে নীল ট্রাকটাকে। কিন্তু অন্ধকারে, লস অ্যাঞ্জেলেসের বিশৃঙ্খলা পথে এটাকে খুঁজে পাওয়া ওদের জন্যে কঠিন।

আবার মেসেজ পাঠানর চেষ্টা করল কিশোর। 'ফার্স্ট কলিং সেকেণ্ড! শুনতে পাচ্ছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এল জবাব। কিন্তু মুসা নয়। একটা অচেনা গলা। অন্য কোন কিশোরের। 'হ্যাল্লো, কে বলছ? এসব ফার্স্ট সেকেণ্ডের মানে কি? কোন রকম খেলায় মেতেছ? তাহলে আমাকেও অংশী নাও।'

'শোন,' দ্রুত বলল কিশোর। 'খেলা নয়, এটা ভয়ানক বিপদ। আমার হয়ে পুলিশকে মেসেজ দিতে পারবে?'

'পুলিশ? কেন?'

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করতে পারবে না ছেলেটা। রসিকতা ধরে নিতে পারে। হুঁশিয়ার হয়ে কথা বলতে হবে তাই। 'একটা ট্রাকের পেছনে রয়েছি, আটকে গেছি। চালক আর তার সঙ্গী জানে না। বেরোতে চাই আমি। পুলিশকে ডাক। ওরা ট্রাকটা থামিয়ে আমাকে বের করে নিক।' সে বুঝে গেছে, এখন বাইরের সাহায্য অবশ্যই দরকার। একমাত্র পুলিশের কাছ থেকেই পাওয়া যাবে সেটা।

'ঠিক আছে, জানাচ্ছি পুলিশকে,' জবাব দিল ছেলেটা। 'লুকিয়ে গাড়ি চড়তে গিয়েছিলে, এখন পড়েছ আটকা এই তো?…জলদি কথা বল! নইলে শিগগিরই রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে! গাড়িটার কি রঙ? নাম্বার কত?'

'বলছি, ভাল করে শোন,' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'নীল ট্রাক, দুই টনী। নাম্বার…'

'কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!' শোনা গেল ছেলেটার গলা। 'আরও জোরে বল!'

মমি

'আমি শুনতে পাচ্ছি,' বলল কিশোর। 'শুনছ? শুনছ?'

'হ্যাল্লো! হ্যাল্লো!' শোনা গেল ছেলেটার গলা। চিৎকার করে কথা বলছে। 'চুপ হয়ে গেলে কেন! যন্ত্রে গোলমাল!...নাকি ট্র্যান্সমিটিং রেঞ্জের বাইরে চলে গেছ...' মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল তার গলা।

হতাশ হয়ে পড়ল কিশোর। এবার কি করবে? ওয়াকি-টকিটা শার্টের ভেতরে ঢুকিয়ে রাখল। মুক্তি পাওয়ার কোন একটা উপায় বের করতে হবে। কিন্তু কোন বুদ্ধি এল না মাথায়। দড়ি দিয়ে শক্ত করে কফিনের সঙ্গে ঢাকনাটা বেঁধে রেখেছে মেথু আর ওয়েব।

ফাঁক আছে, বাতাস চলাচল করছে যথেষ্ট, সেদিক থেকে কোন ভয় নেই। ভয় পাচ্ছে, ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ট্রাক থামলে, মেথু আর ওয়েব কফিনের ঢাকনা খোলার পর কি ঘটবে ভেবে, ঢোক গিলল সে। ঘামতে শুরু করল। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে, তিন দুর্বৃত্ত ঘিরে দাঁড়িয়েছে কফিনটা। অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। তার সাক্ষীতে তিনজনই জেলে যাবে। এবং সেখানে কিছুতেই যেতে চাইবে না ওরা। সুতরাং একটাই কাজ করবে ওরা। নিশ্চিহ্ন করে দেবে সাক্ষীকে। এছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই তাদের জন্যে।

চিন্তার মোড় ঘোরাল কিশোর। কি করে ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে? যদি ঢাকনা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দৌড় দেয়? অবাক হয়ে যাবে ওরা! কয়েক মুহূর্ত দেরি করে ফেলবে সক্রিয় হয়ে উঠতে। এই সুযোগে কি পালিয়ে যেতে পারবে?

মনে হয় না!—ভাবছে কিশোর। ওরা তিনজন। যেদিকেই ছোটার চেষ্টা করুক সে, কারও না কারও হাতে ধরা পড়বেই।...আচ্ছা, তার চাচা-চাচী কি কাঁদবে তার জন্যে? মন খারাপ করবে? মেরিচাচী নিশ্চয় কাঁদবে, এতে কোন সন্দেহ নেই তার। চাচাও কাঁদবে গোপনে। আর তার বন্ধুরা? মুসা আর রবিন?

ভাবতে ভাবতে গলার কাছে কি যেন দলামত একটা উঠে এল কিশোরের। এই সুন্দর পৃথিবীতে আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই তার...ঠিক এই সময় ছিন্ন হয়ে গেল চিন্তাসূত্র। থেমে গেছে ট্রাক। উত্তেজিত হয়ে পড়ল কিশোর। ধ্বক করে উঠেছে বুকের ভেতর। এসে গেছে সময়। যে-কোন মুহূর্তে উঠে এসে কফিন নামিয়ে নেবে মেথু আর ওয়েব।

কিন্তু এল না ওরা। মিনিট পাঁচেক পর আবার চলতে শুরু করল ট্রাক। মনে পড়ে গেল কিশোরের, অর্ধেক পথ এসে মক্কেলের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার কথা দুই চোরের। নতুন নির্দেশ থাকলে, জেনে নেবে।

আবার নানারকম ভাবনা এসে ভিড় করল কিশোরের মনে। অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে, অনেক সুখের মুহূর্ত। অনেক কিছুই ভাবল সে, কিন্তু মুক্তির কোন উপায় বের করতে পারল না। সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি কিশোর।

আবার কতক্ষণ পর থামল ট্রাক, বলতে পারবে না।

লোহার দরজা উঠে যাওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে আবার কিশোর। টান টান হয়ে গেছে স্নায়ু। চলে গেছে বিষণ্ণ ভাবটা। শুয়ে শুয়ে কাপুরুষের মত মরবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাবে। তবে, প্রথমে দৌড়ে পালানর চেষ্টা করবে।

ট্রাকের দরজা খুলে গেল। ভারি পায়ের শব্দ। উঠে এসেছে মেথু আর ওয়েব। নড়ে উঠল কফিন।

'অদ্ভুত একটা কাণ্ড, জান!' শোনা গেল ওয়েবের গলা। 'স্টোর রুমে যখন ঠেলেছিলাম, একেবারে হালকা মনে হয়েছিল কফিনটা। যখন তুলতে গেলাম ট্রাকে, বেজায় ভারি। এখনও তাই!'

অন্য সময় হলে, খুব একচোট হেসে নিত কিশোর। ওয়েবের বিস্মিত চেহারা সহজেই কল্পনা করতে পারছে। কফিনটার ওজন অন্তত একশো পাউণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে সে। এই ওজন অবাক করবেই ওয়েব কিংবা মেথুকে। সামনে ভয়ানক বিপদ, তাই হাসতে পারল না কিশোর।

ধরাধরি করে নামানো হল কফিনটা

শোনা গেল তৃতীয় আরেকটা গলা। 'গ্যারেজের ভেতরে নিয়ে এস, জলদি!' চাপা কণ্ঠস্বর, কিন্তু কেমন যেন পরিচিত মনে হল কিশোরের। এর আগে কোথাও শুনেছে! কোথায়?

আবার শূন্যে উঠল কফিন। খানিক পরেই পুপ্‌পুপ্‌ করে নামানো হল আবার। সিমেন্টের মেঝেতে নামিয়েছে।

'গুড,' বলল তৃতীয় কণ্ঠ। মুখে রুমাল চেপে আছে নাকি! এমন চাপা কেন? 'মিনিট দশেকের জন্যে বাইরে যাও তোমরা। তারপর এসে নিয়ে যাবে মমি আর কফিন। আজই নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে।'

'আগে টাকা, তারপর বেরব,' গোঁয়ারের মত বলে উঠল ওয়েব। 'টাকা দাও, নইলে ছুঁতেও দেব না এটা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল তৃতীয় কণ্ঠ। 'অর্ধেক পাবে এখন। পোড়াতে নিয়ে যাওয়ার আগে দেব বাকিটা।'

খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। নিশ্চয় দড়ি খুলছে ওয়েব কিংবা মেথু। কফিনটাও নড়ে উঠল একবার।

'আরে, দড়ি নিচ্ছ কোথায়?' বলল মেথু। 'এখানেই থাক। আবার বেঁধে নিতে হবে না কফিনটা?'

'চল, টাকা নেবে,' বলল তৃতীয় কণ্ঠ। 'আয়, জলদি এস!'

দরজা নামানর শব্দ শুনল কিশোর। তারপর নীরবতা। ঘরে আর কেউ নেই, বোঝাই যাচ্ছে। আস্তে করে ঢাকনা তুলে উঁকি দিল সে। আবছা অন্ধকার। কাচের

বন্ধ শার্সি দিয়ে বাইরের আলো এসে পড়েছে ম্লান হয়ে। একটা গ্যারেজ, প্রাইভেট গ্যারেজ। ঘরে আর কেউ নেই। সাবধানে কোন রকম আওয়াজ না করে বেরিয়ে এল সে। জায়গামত নামিয়ে দিল আবার কফিনের ঢাকনা। ঠিক এই সময় আবার দরজা উঠতে শুরু করল।

তড়াক করে লাফিয়ে এসে দরজার পাশে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়াল কিশোর। অর্ধেক উঠেই থেমে গেল দরজা। ঘরে এসে ঢুকল এক লোক। টেনে আবার নামিয়ে দিল দরজা। উজ্জ্বল আলো থেকে এসেছে, বোধহয় সেজন্যেই আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরকে দেখতে পেল না সে। ঘুরে এগিয়ে গেল কফিনের দিকে। হাতের তালু ডলছে।

'অবশেষে পেলাম!' বিড়বিড় করে বলল লোকটা কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে। 'এতগুলো বছর পর!' পেকেট থেকে একটা টর্চ বের করে আলো ফেলল কফিনটার ওপর। খুব বেশি সতর্ক, তাই গ্যারেজের আলো জ্বালছে না।

উবু হয়ে ঢাকনা তুলে নামিয়ে রাখল কাত করে, কফিনের গায়ে ঠেস দিয়ে। ঝুঁকে হাত বোলাতে শুরু করল কফিনের ভেতরের দেয়ালে। অনুভবে বোঝার চেষ্টা করছে কিছু।

স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠল যেন কিশোর। দুই লাফে পৌঁছে গেল লোকটার পেছনে। জোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে কফিনের ভেতর। ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পা দুটো। ঢাকনাটা তুলেই বসিয়ে দিল জায়গামত। তারপর চড়ে বসল ওটার ওপর। মূল অপরাধীকে আটকে ফেলেছে। এরপর কি করবে? কতক্ষণ রাখতে পারবে আটকে?

ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে শুরু করেছে লোকটা। চেঁচাচ্ছে। তবে খুব বেশি শোনা যাচ্ছে না চিৎকার। ঢাকনা বন্ধ, বাতাস চলাচল করতে পারছে না। গ্যারেজের দরজা নামানো। কিশোরই শুনতে পাচ্ছে না ভালমত, বাইরে থেকে শুনতে পাবে না মেথু কিংবা ওয়েব?

ঢাকনাসুদ্ধ কিশোরকে ঠেলে ফেলে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে লোকটা। একেবারে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ঢাকনা, চেপে আবার নামিয়ে দিচ্ছে কিশোর। ঘামছে দরদর করে। খুব বেশিক্ষণ এভাবে আটকে রাখতে পারবে না, বুঝতে পারছে। ছুটে গিয়ে দরজা তুলতে সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে বেরিয়ে এসে তাকে ধরে ফেলবে লোকটা। বাইরে নিশ্চয় পাহারায় রয়েছে দুই চোর। ওরাও মক্কেলের সাহায্যে ছুটে আসবে। সুতরাং ঢাকনায় চেপে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই তার। তবে সেটাও নিরাপদ নয়। দশ মিনিট পর এসে কফিনটা নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আসবে মেথু আর ওয়েব। তারমানে, খামোকাই কষ্ট করছে কিশোর। ঠেকাতে পারবে না ওদেরকে শেষ অবধি।

সতেরো

হঠাৎ বাইরে শোনা গেল অনেক মানুষের গলা। চিৎকার। হুঁশিয়ারি। গাড়ির হর্নের শব্দ। আরও চেঁচামেচি। ধুপধাপ শব্দ। মারামারি করছে যন কারা!

বাইরের দিকে খেয়াল করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হয়ে পড়ল কিশোর। এই সুযোগে এক জোর ধাক্কায় ঢাকনাসহ কাত করে প্রায় ফেলেই দিয়েছিল তাকে লোকটা। তাড়াতাড়ি সামলে নিল কিশোর। চাপ বাড়াল আবার ঢাকনাটায়। ঠিক এই সময় ঘট-ঘটাং আয়াজ তুলে উঠে গেল দরজা।

'কে ওখানে!' অন্ধকারে শোনা গেল একটা পরিচিত কণ্ঠ। আলোর সুইচ খুঁজে পেল লোকটা। জ্বলে উঠল আলো। দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ব্যাভারিয়ান। রোভার।

হঠাৎ করেই কফিনের তলায় ঠেলাঠেলি থামিয়ে দিয়েছে বন্দী। মিটমিট করে দরজার দিকে তাকাচ্ছে কিশোর। রোভারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা, রবিন, জামান, প্রফেসর বেনজামিন আর জলিল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই তার দিকে।

অবশেষে কথা ফুটল রোভারের, 'কিশোর, তুমি হোকে?'

'হোকে,' মাথা নাড়াল কিশোর। তার কথার ধরনে হেসে ফেলল সবাই, এমনকি রোভারও। জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'তোমরা এলে কি করে? চোর দুটো কোথায়?'

জবাবটা দিল রবিন। 'তোমাদের ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম...' তার কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড ঠেলা লাগাল কফিনের ঢাকনায়। প্রায় পড়ে যেতে যেতে আবার সামলে নিল কিশোর। বিস্মিত চোখে কফিনের দিকে চেয়ে বলল রবিন, 'ভেতরে কি!'

'হ্যাঁ, কি?' রবিনের কথার প্রতিধ্বনি করলেন যেন প্রফেসর। গোল্ডরিম চশমার কাচের ওপাশে গোল গোল হয়ে উঠছে তাঁর চোখ।

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল কিশোর। 'নাটের গুরু। দুই মাস আগে যে এই খেল শুরু করেছিল। সেই জ্যোতিষ, যে গিয়েছিল লিবিয়ায় জামানদের বাড়িতে। বিশ্বাস করিয়েছিল, রা-অরকন তাদের পূর্বপুরুষ। মমিসহ কফিনটা চুরির প্রেরণা জুগিয়েছে জামান আর জলিলকে।'

'জ্যোতিষ! সেই জ্যোতিষ!' চেঁচিয়ে উঠল জামান। 'কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'অসম্ভব!' জলিলও চেঁচিয়ে উঠল। 'এ হতেই পারে না! ওই জ্যোতিষ রয়ে গেছে লিবিয়ায়!'

'নিজের চোখেই দেখতে পাবেন কোথায় রয়ে গেছে,' জলিলের দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'পালানর চেষ্টা করলে রুখবেন আপনাদের জ্যোতিষকে।'

আস্তে করে ঢাকনার ওপর থেকে নেমে এল কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে খুলে গেল ডালা, কাত হয়ে পড়ল একপাশে। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। চেহারা ফেকাসে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

'জ্যোতিষ!' চেঁচিয়ে উঠল জামান। 'ও জ্যোতিষ নয়। সে লোকটা বুড়ো ছিল! চুলদাড়ি সব সাদা! এক চোখ কানা! কুঁজো! এ তো রীতিমত জোয়ান!'

'ছদ্মবেশে গিয়েছিল তোমাদের বাড়িতে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

হাঁ হয়ে গেছেন যেন প্রফেসর, মুসা আর রবিন। বোকার মত চেয়ে আছে কফিনে দাঁড়ানো লোকটার দিকে।

'উইলসন!' বিড়বিড় করলেন অবশেষে প্রফেসর।

'হ্যাঁ, উইলসন,' জবাব দিল কিশোর। 'জামানদের প্রিয় জ্যোতিষ। মিসেস চ্যানেলের বেড়াল-চোর। মমিচোর! কফিনচোর।'

'ও চোর! উইলসন চোর!' বিশ্বাস করতে পারছেন না যেন প্রফেসর বেনজামিন। 'কিন্তু সে কেন চোর হবে? এসব কেন চুরি করতে যাবে?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা কাত করলেন উইলসন। 'ছেলেটা ঠিকই বলেছে। আমি চোর। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই অপেক্ষা করে আছি মমি আর কফিনটার জন্যে। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। হাতে পেয়েও হারালাম দশ লক্ষ ডলার! কে জানে, বিশ কিংবা তিরিশ লক্ষও হতে পারে!'

'হ্যাঁ!' সামনে বাড়াল জলিল। কঠোর চোখে চেয়ে আছে উইলসনের দিকে। 'ও-ই সেই জ্যোতিষ! গলার স্বর, কথা বলার ধরন!...এখন চিনতে পারছি! এই লোকই গিয়েছিল আমার মনিবের বাড়িতে। বুঝিয়েছে, রা-অরকন তাঁদের পূর্বপুরুষ। ঠকিয়েছে ওদেরকে। লোকটা একটা ভণ্ড, শয়তান, মিথ্যুক!' থুথু ছিটিয়ে দিল সে উইলসনের মুখে।

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে ফেলল উইলসন। করুণ হয়ে উঠেছে চেহারা, কেঁদে ফেলবে যেন। 'এসব আমার পাওনা!' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে মুখ তুললেন। 'প্রফেসর, শুনতে চান, কেন মমি আর কফিনটার জন্যে চোর হয়েছি আমি?'

'নিশ্চয়!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, 'ইচ্ছে করলেই, যখন খুশি আমার ওখানে গিয়ে মমিটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে পারতে তুমি। চুরি করতে গেলে কেন?'

হাত তুলল কিশোর। 'এক মিনিট। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। মেথু আর ওয়েবকে ধরা হয়েছে?'

'বাইরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি ব্যাটাদের,' জবাব দিল রোভার।

'ছুটতে পারবে না তো?'

মাথা নাড়ল রোভার।

উইলসনের দিকে ফিরল কিশোর। 'আপনার কথা এবার বলুন।'

'আসলে, মমিটা মোটেই চাইনি আমি,' কফিন থেকে নেমে এল উইলসন। 'আমার দরকার ছিল এই কাঠের বাক্সটা। প্রফেসর, রা-অরকনের মমিটা যেদিন আবিষ্কার করলেন, আমার বাবা ছিল আপনার সঙ্গে।'

'ছিল,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'খুব ভাল মানুষ ছিল। কায়রোর বাজারে খুন হল বেচারা!'

'সেদিন আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন বাবা,' বলল উইলসন। 'যা আপনি জানেন না। জানানো হয়নি আপনাকে। সমাধি মন্দিরে বসে কফিনটা পরীক্ষা করছিল বাবা। গোপন একটা কুঠুরি পেয়ে গেল কফিনে, হঠাৎ করেই। ছোট একটা কাঠের টুকরো দিয়ে বন্ধ ছিল কুঠুরির মুখ। ওটার ভেতরে আছে···দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।' যন্ত্রপাতির বাক্স খুলে ছোট একটা করাত বের করে নিয়ে এল ভাষাবিদ। একপাশে কাত করে ফেলল কফিনটা। একটা জায়গায় করাত বসাতে যাবে, হাঁ হাঁ করে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন।

'না না, ওকাজ কোরো না!' চেঁচিয়ে বললেন প্রফেসর। 'কফিনটা খুব মূল্যবান অ্যানটিক, তুমিই বলেছ!'

'ভেতের যা আছে, তার তুলনায় কিছু না,' মলিন হাসি ফুটল উইলসনের ঠোঁটে। 'তাছাড়া, এক টুকরো কাঠ আপনার দরকার এটা থেকে, কার্বন টেস্টের জন্যে। কাঠের টুকরোটা শক্ত আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছিল বাবা। করাত দিয়ে না কেটে ওটা খোলা যাবে না। সত্যি বলছি, কাটা ছাড়া খোলা গেলে এটা চুরি করার দরকার হত না। আপনার বাড়িতেই কোন এক ফাঁকে খুলে ভেতরের জিনিসগুলো নিয়ে চলে আসতে পারতাম।' কফিনে করাত বসিয়ে চালাতে শুরু করল ভাষাবিদ। কাজ করতে করতেই বলল, 'আমার বাবা, একটা চিঠি লিখেছিল আমার কাছে। তাতে লেখা ছিল সব কথা। তার মৃত্যুর পরে ওই চিঠি এসে হাতে পৌঁছে আমার। আমি তখন কলেজে পড়ছি। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম মিশরে। কিন্তু তখন কায়রো জাদুঘরে মমিসহ কফিনটা জমা দিয়ে ফেলেছেন আপনি। আমার আর কিছুই করার থাকল না। অপেক্ষা করে রইলাম, বছরের পর বছর। তারপর, মাস দুই আগে খবর পেলাম, কায়রো জাদুঘর থেকে আপনার নামে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে মমিটা। সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেলাম মিশরে। অনেক খুঁজে বের করলাম এক সম্ভ্রান্ত, ধনী লিবিয়ান পরিবারকে, যাঁরা নিজেদেরকে ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করে। জ্যোতিষের ছদ্মবেশে গিয়ে একদিন হাজির হলাম তাঁদের বাড়িতে। সহজেই বিশ্বাস করিয়ে ফেললাম, রা-অরকন তাঁদের পূর্বপুরুষ। বোঝালাম, যে করেই হোক, মমিটা আমেরিকান প্রফেসরের কাছ থেকে তাঁদের ফিরিয়ে নেয়া উচিত। আমি চেয়েছিলাম, মিস্টার জামান লোক পাঠাক আপনার কাছে মমিটা নেয়ার জন্যে।

ওরা এলে আপনি ফিরিয়ে দেবেন, খুব ভাল করেই জানিঃ তারপর লোক দিয়ে চুরি করাতাম ওটা, আপনি কিংবা পুলিশ ভাবত, লিবিয়ান ওই ব্যবসায়ীই চুরি করিয়েছে মমিটা। সব দোষ তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ত। আমি থেকে যেতাম আড়ালে। হয়ত বিশ্বাস করবেন না, প্রফেসর, চুরি করতে খুব খারাপ লাগছিল আমার। তাই সেটা না করে যাতে কাজ হাসিল হয়ে যায়, সেজন্যে অনেক ভেবে আরেক উপায় বের করেছিলাম। মমিটাকে কথা বলিয়েছি। ভেবেছি, ভয় পেয়ে আপনি ওটা ফেলে দেবেন, কিংবা কিছু একটা করবেন। আমি কফিনটা থেকে জিনিসগুলো হাতিয়ে নেয়ার সুযোগ পাব। অথবা, প্রাচীন ভাষা বুঝতে না পেরে আমাকে ডাকবেন। ডেকেছেনও। কিন্তু আমি আপনাকে মমিটা আমার বাড়িতে আনতে দিতে রাজি করাতে পারলাম না। তাহলেও চুরির দরকার পড়ত না। জিনিসগুলো খুলে নিয়ে আবার আপনার জিনিস আপনাকে ফেরত দিতাম। কিন্তু সেটাও হল না। আপনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজি হলেন না মমি। কি আর করব? বেপরোয়া হয়ে...'

'চুরি করেছ!' ধমকে উঠলেন প্রফেসর বেনজামিন। 'খুব ভাল কাজ করেছ! বাপের নাম রেখেছ! গাধা কোথাকার! তোমার বাপও ছিল একটা গাধা! আমাকে সব কথা খুলে বললেই পারত! তুমি না জানতে পার, কিন্তু তোমার বাপ তো জানত, টাকার কাঙাল আমি কখনও ছিলাম না, এখনও নই।'

মুখ নিচু করে করাত চালাচ্ছে উইলসন। খুলে আনল ছোট একটা টুকরো। একটা ফোকরের মুখ বেরিয়ে পড়ল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সে।

সব ক'টা চোখ উইলসনের হাতের দিকে। ফোকর থেকে কি বের হয়ে আসে দেখার জন্যে উদগ্রীব।

হাত বের করে আনল উইলসন। একটা কাপড়ের পুটুলি, ছোট। সাবধানে পুটুলিটা খুলল মেঝেতে রেখে। কাপড় সরাল। আলোয় জ্বলে উঠল যেন তরল আগুন। লাল, নীল, কমলা, সবুজ।

'রত্ন!' কথা আটকে গেছে প্রফেসরের। সামলে নিয়ে বললেন, 'ফারাওয়ের রত্ন! দশ লক্ষ বলছ! কিচ্ছু জান না! ওগুলোর অ্যানটিক মূল্যই ত্রিশ-চল্লিশ লক্ষ ডলার! তার ওপর রয়েছে পাথরের দাম!'

'তাহলে বুঝতেই পারছেন, কেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলাম,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইলসন। 'প্রফেসর, আমার বাবা এই পাথরের জন্যেই খুন হয়েছিল। তিন-চারটে পাথর বের করে নিয়েছিল। ওগুলোর মূল্য জানার চেষ্টা করেছিল কায়রো বাজারের এক জুয়েলারীর দোকানে গিয়ে। পড়ে গেল বদ লোকের চোখে। এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে আগেই অনুমান করেছিল বাবা। তবু কৌতূহল দমন করতে পারেনি। বাজারে যাবে, এটাও চিঠিতে লিখেছিল।'

'অথচ গাধাটা আমাকে বলেনি,' বলে উঠলেন প্রফেসর। 'তাহলে এটা ঘটতে

দিতাম না কিছুতেই। কপালে লেখা ছিল অপমৃত্যু, কি আর হবে ওসব বলে!' থামলেন। চোখ মিটমিট করে তাকালেন উইলসনের দিকে। 'যা হওয়ার তো হয়েছে। রা-অরকনের মমিটা কি করেছ?'

'ওখানে,' গ্যারেজের পেছন দিকটা দেখিয়ে বলল উইলসন। 'চট দিয়ে ঢেকে রেখেছি।'

'যাক!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। 'আমার গবেষণা...' থেমে গেলেন তিনি। উইলসনের দিকে তাকালেন। 'ওসব কথা এখন থাক। তোমার কথা আগে শুনি। অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। প্রথমেই শুনতে চাই, মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছ?'

দুই কাঁধ ঝুলে পড়েছে উইলসনের। জীবনের সব আশা-ভরসাই নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে যেন তার। রত্নের পুটুলিটা আবার বেঁধে প্রফেসরের হাতে দিয়ে বলল, 'এখানে গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর কত? চলুন, ঘরে চলুন। বসবেন।'

আঠারো

মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিস। মস্ত ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। হাতে ক্লিপে আটকানো এক গাদা টাইপ করা কাগজ। পড়ছেন গভীর মনোযোগে।

পড়া শেষ করে কাগজগুলো ডেস্কে রাখলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। মুখ তুললেন, 'চমৎকার! খুব উত্তেজনা গেছে কয়েকটা দিন তোমাদের!'

শুধু উত্তেজনা? মুসার মনে পড়ে গেল, কফিনে আটকে থাকা মুহূর্তগুলোর কথা। কিশোরেরও মনে পড়ল। তবে ওসব নিয়ে বেশি ভাবতে চাইল না আর। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অবশেষে ভালয় ভালয়ই তো শেষ হয়েছে সব।

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'তাহলে কাহিনীটা নিয়ে ছবি করছেন?'

'নিশ্চয়,' মাথা নাড়লেন চিত্রপরিচালক। 'এ-তো রীতিমত ভাল কাহিনী। আচ্ছা, কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো এবার।'

'কোন কথা কি বাদ গেছে, স্যার?' ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের। কারণ লেখার ভার ছিল তার ওপর।

'এই দুয়েকটা ব্যাপার,' বললেন চিত্রপরিচালক। 'তবে, সেটাকে ভুল বলা চলে না। তুমি তো গল্প লেখনি, রিপোর্ট লিখেছ। যাই হোক এগুলো জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'বলুন, স্যার,' বলল রবিন।

'মিশরের আরও দু'একজন রাজাকে অতি সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া

হয়েছে,' হাতের দশ আঙুলের মাথা একত্র করে একটা পিরামিড বানালেন যেন পরিচালক। 'তাঁদের সঙ্গে গোপনে দিয়ে দেয়া হয়েছে অনেক মূল্যবান রত্ন। বোধহয় পরকালের পাথেয় হিসেবে। কিন্তু কথা হল, তাদেরকে ওভাবে সাধারণ মানুষের মত কবর দেয়া হল কেন? হয়ত কবর-চোরদের ভয়ে। তবে এসব ব্যাপারে এখনও শিওর নন বিজ্ঞানীরা। রা-অরকনকেও নিশ্চয় তেমনি কোন কারণে সাধারণ ভাবে কবর দেয়া হয়েছিল।'

'প্রফেসর বেনজামিনের তাই ধারণা,' বলল রবিন।

'কিন্তু সেটা আমাদের আলোচ্য নয়,' বললেন পরিচালক। 'ওসব প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরাই মাথা ঘামাক। আমরা আমাদের কথা বলি। মিসেস চ্যানেলের বেড়ালটা কে চুরি করেছিল, এটা এখন পরিষ্কার। উইলসন কাউকে দিয়ে করিয়েছিল। মমি চুরি করেছে মেথু আর ওয়েব। কখন করল?'

'আমি, কিশোর আর প্রফেসর বেনজামিন টেপটা নিয়ে গিয়েছিলাম উইলসনের বাড়িতে,' বলল রবিন। 'যখন কথা বলছিলাম উইলসনের সঙ্গে, তখন একবার কলিং বেল বেজে উঠেছিল আমরা থাকতেই। মমিটা নিয়ে ফিরে এসেছিল মেথু আর ওয়েব। কফিনটা আনেনি বলে সে সময়ই ধমক-ধামক মেরেছিল ওদেরকে তাষাবিদ। আবার পাঠিয়েছিল কফিনটা চুরি করতে।'

'আনুবিস সেজে হুপারকে ভয় দেখিয়েছিল কে? নিশ্চয় মেথু কিংবা ওয়েব?'

'ওয়েব, স্যার। ভয় দেখিয়েই কাবু করে ফেলেছিল বেচারাকে। ওকে সামনে রেখে কিছুতেই চুরি করতে পারত না ওরা। ওদের বর্ণনা, ট্রাকের বর্ণনা ওরা বাড়ি থেকে বেরোনর সঙ্গে সঙ্গে ফোনে পুলিশকে জানিয়ে দিত খানসামা। ভয় পেয়েও বেহুঁশ না হলে হয়ত পিটিয়ে বেহুঁশ করত।'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝেছি। বুঝতে পারছি না, নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেলেও এত তাড়াতাড়ি, ঠিক সময়ে গিয়ে কি করে হাজির হল উইলসনের বাড়িতে?'

'মুসা, তুমি বল,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' সোজা হয়ে বসল মুসা। 'নীল ট্রাকটাকে হারিয়ে ফেললাম। আমরা তখন ধরে নিয়েছি, জলিলই অপরাধী। ওকে ধরতে হলে, আগে প্রফেসর বেনজামিনের বাড়িতে যেতে হবে। তিনি রিগো অ্যাণ্ড কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে জলিলের বাসার ঠিকানা জানতে পারবেন। তাই করা হল। জলিলের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তিনজন কার্পেট ব্যবসায়ীকে সে বিদায় জানাচ্ছে। আমাদের মুখে নীল ট্রাক আর মেথু-ওয়েবের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। বুঝলাম, সে কিছু জানে না। অপরাধী সে নয়। তখন এমন অবস্থা, পুলিশকে জানানো ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু প্রফেসর তখনও পুলিশকে জানাতে দ্বিধা করছেন। অবশেষে ঠিক করলেন, উইলসনের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সময়ে-অসময়ে কোন বিপদ কিংবা বেকায়দায় পড়লেই পরামর্শ নিতে যেতেন প্রফেসর তার কাছে। আগে যেতেন

ভাষাবিদের বাবার কাছে। যাই হোক, গেলাম...'

'এবং গিয়েই দেখলে নীল ট্রাকটা,' মৃদু হাসলেন পরিচালক। 'নিশ্চয় খুব চমকে গিয়েছিলে।'

'মেথু আর ওয়েবকে ধরে খুব পিট্টি দিয়েছে, স্যার, ওরা,' হেসে বলল কিশোর। 'পিটুনি খেয়ে ওরা বলেছে, কফিনটা গ্যারেজে আছে। পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে ওদেরকে। আগেও অনেক অপরাধ করেছে, রেকর্ড রয়েছে পুলিশের খাতায়। প্রমাণের অভাবে ধরতে পারছিল না এতদিন। এখন তো প্রচুর চোরাই মালসহ ওদের আস্তানাটাই পাওয়া গেছে।' থামল সে। তারপর বলল, 'প্রফেসর উইলসনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করেননি প্রফেসর বেনজামিন। কাজেই বেঁচে গেছেন তিনি। মিডল ঈস্টে চলে গেছেন প্রাচীন ভাষার ওপর গবেষণা করতে।'

'রত্নগুলো?'

কায়রো মিউজিয়মে দান করে দিয়েছেন প্রফেসর বেনজামিন, প্রফেসর উইলসনেরও সায় রয়েছে এতে। তবে তাকে একেবারে খালি হাতে বিদায় করেনি মিউজিয়ম। গবেষণা আর মিশরে তার থাকার সমস্ত খরচ বহন করবে ওরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি তো রয়েছেই। মোটা বেতন পাচ্ছে ওখান থেকে, পেতেই থাকবে। ওরাও এটাকে একটা মিশন হিসেবে ধরে নিয়েছে। মিশনের খরচ বেঁচে যাওয়ায় বরং খুশিই বিশ্ববিদ্যালয়।'

'গুড,' কিশোরের দিকে সরাসরি তাকাল পরিচালক। 'আসল রহস্যটাই জানা হল না এখনও। মমিটাকে কি করে কথা বলিয়েছে উইলসন?'

'ও, ওটা?' হাসি গোপন করল কিশোর। 'ভেন্ট্রিলোকুইজম, স্যার। রবিনের বাবা ঠিকই বলেছিলেন।'

ভুরুজোড়া কাছাকাছি চলে এল পরিচালকের। 'ইয়ং ম্যান, সিনেমা ব্যবসায়ে অনেক বছর ধরে আছি। আমি জানি, ঠিক কতখানি দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকইস্টরা। মনে হবে পুতুলের মুখ দিয়েই কথা বেরিয়ে আসছে। কিন্তু সেজন্যে ওটার খুব কাছাকাছি থাকতে হয় তাদের। দূর থেকে মোটেও সম্ভব না।'

চাওয়া-চাওয়ি করল মুসা আর রবিন। তারা জানত, অনেক দূর থেকে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে ভেন্ট্রিলোকুইস্টরা।

'কিন্তু, স্যার,' বলল কিশোর। 'প্রফেসর উইলসন পেরেছেন। তবে ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে ছিলেন তিনি সব সময়। সেজন্যেই প্রথমে তাকে সন্দেহ করতে পারিনি। তবে করা উচিত ছিল। কারণ, কাছাকাছি তিনিই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি মিশরের প্রাচীন ভাষা জানেন। কিন্তু বেড়ালের পায়ে রঙ করা হয়েছে, এটা জানার আগে তার কথা খেয়ালই করিনি। বেড়ালটা ছদ্মবেশী। সন্দেহ হল, জ্যোতিষও ছদ্মবেশী। প্রথমেই মনে এল, প্রফেসর বেনজামিন ছাড়া আর কে

সবচেয়ে বেশি জানে রা-অরকন সম্পর্কে? প্রফেসর উইলসন। প্রাচীন মিশরীয় ভাষা জানেন। ধ্যানে বসার অভিনয় করে অনর্গল বলে যেতে পারা কিছুই না তার জন্যে।'

'ঠিকই ভেবেছ,' বললেন পরিচালক। 'কিন্তু এসব তো শুনতে চাই না। আমার প্রশ্ন এটা নয়।'

'আসছি, স্যার, সে কথায়,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'প্রফেসর উইলসন ভাষাবিদ। অনেক ধরনের মাইক্রোফোন, টেপ-প্লেয়ার আর রেকর্ডার ব্যবহার করতে হয়। আপনি নিশ্চয় জানেন স্যার, আজকাল একধরনের প্যারা-বলিক মাইক্রোফোন বেরিয়েছে, যার সাহায্যে শত শত ফুট দূরের শব্দও রেকর্ড করা যায়।'

'জানি,' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে পরিচালকের চেহারা। 'বলে যাও।'

'এ-ও জানেন, স্যার, একধরনের স্পীকার আছে, ডিরেকশন্যাল স্পীকার, যার সাহায্যে শব্দকে···ইয়ে, কি বলব। ···জমাট করে ফেলা যায় বলি···। হ্যাঁ, জমাট করে ফেলে শত শত ফুট দূরে চালান করে দেয়া যায়। ওই ধরনের মাইক্রোফোন আর স্পীকার আছে প্রফেসর উইলসনের বাড়িতে। প্রফেসর বেনজামিনের বাড়ি থেকে সরাসরি তিনশো ফুট দূরে অর বাড়ি।' চুপ করল কিশোর।

'বল, বল, বলে যাও, তোমার কথা শেষ কর,' তাগাদা দিলেন পরিচালক।

'প্রাচীন আরবী ভাষায় কিছু কথা টেপে রেকর্ড করেছিলেন প্রফেসর উইলসন। টেলিস্কোপ আছে তার। প্রফেসর বেনজামিন কাজ করেন জানালা খুলে। সুতরাং কখন তিনি কাজ করেছেন, দেখতে অসুবিধা হত না ভাষাবিদের, কথা ছুঁড়ে দিতে পারতেন মেশিনের সাহায্যে। স্পীকার ফোকাস করে লাইন দেয়াই ছিল প্লেয়ারের সঙ্গে। ক্যাসেটটা ভরে শুধু প্লে বাটনটা টিপে দিতেন। বাস শুরু হয়ে যেত মমির কথা বলা। সকালে চলে যেতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কাজে। ফিরতেন দুপুরের পর। তাই, মমিটা যখনই কথা বলেছে, বলেছে বিকেলে, অর্থাৎ দুপুরের পর যে-কোন এক সময়। এবং বলেছে শুধু প্রফেসর বেনজামিনের উপস্থিতিতেই। কারণ শুধু তাকেই ভয় পাওয়ানর দরকার ছিল উইলসনের। আমার সামনে কথা বলেছে, কারণ দূর থেকে আমার ছদ্মবেশ ধরতে পারেননি ভাষাবিদ। কিন্তু যখন কফিনে দাড়ি আটকে গেল আমার, খুলে রয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কথা থামিয়ে দিল মমি।' হাসল কিশোর।

'হুমম্!' ওপরে নিচে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'আনুবিসের মুখের বিচিত্র ভাষাও তাহলে তাঁরই কাজ!'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল কিশোর। 'আসলে ওয়েব যখন আনুবিস সেজে হুপারের সামনে আসছে, তার মুখে ভাষা ছুঁড়ে দিয়েছে ভাষাবিদের মেশিন। ব্যাপারটার নাম দিয়েছি আমি, উইলসনস-ভেন্ট্রিলোকুইজম।'

'প্রতিভা আছে লোকটার!' স্বীকার করলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তবে আবার কোন কুকর্মে জড়িয়ে না পড়লেই হল!'

'আর করবে বলে মনে হয় না, স্যার। যা লজ্জা পেয়েছে!'

'হুঁ। তবে লোভ বড় ভয়ানক জিনিস!...যাই হোক, আমরা আশা করব, এরপর থেকে তার বিজ্ঞান সাধনা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে উইলসন।'

নীরবতা।

'তাহলে।' নড়েচড়ে উঠল কিশোর, 'আমরা তাহলে আজ উঠি, স্যার?'

'আচ্ছা।...হ্যাঁ, ভাল কথা। জামান আর তার ম্যানেজার তো নিশ্চয় লিবিয়ায় ফিরে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' উঠে দাঁড়িয়েছে কিশোর। 'তাদের কোম্পানির সবচেয়ে ভাল একটা কার্পেট পাঠাবে বলেছে, তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারের জন্যে।'

'ভেরি গুড,' পরিচালকও উঠে দাঁড়ালেন। 'রকি বীচের ওদিকে একটা কাজ আছে আমার। যেতে হবে এখনি। চল, তোমাদেরকে একটা লিফট দিই।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল তিন গোয়েন্দা।

— o —